NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Choice Based Credit System
(CBCS)

SELF LEARNING MATERIAL

HCO
COMMERCE

CC-CO-09
Indian Financial System

Under Graduate Degree Programme

উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ'-গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল — 'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল' / 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক— উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই নতুন শিক্ষাক্রম এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি. কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস. পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন— যদিও পূর্বের পরম্পরা অনুযায়ী অন্যান্য বিদ্যায়তনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একথা বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির এই বিদ্যায়তনিক উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। মুক্তশিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)

(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)

বিষয় : সাম্মানিক বানিজ্য **(Commerce)**

Subject : Honours in Commerce [B.Com (H) / (HCO)]

পাঠক্রম : ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থা

(Indian Financial System)

Course Code : CC-CO-09

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, 2022

First Print : August, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষার ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)

(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)

বিষয় : সাম্মানিক বানিজ্য **(Commerce)**

Subject : Honours in Commerce [B.Com (H) / (HCO)]

পাঠক্রম : ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থা

(Indian Financial System)

Course Code : CC-CO-09

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

ড. অনির্বাণ ঘোষ
Professor of Commerce
NSOU (Chairperson)

ড. উত্তম কুমার দত্ত
Professor of Commerce
NSOU

ড. সজল কুমার মাইতি
Profesor of Commerce (PG Dept.)
Hooghly Mohsin College

ড. আশিষ কুমার সানা
Professor of Commerce
University of Calcutta

সি. এ. শুভায়ন বসু
Associate Professor
Ananda Mohan College

ড. চিত্ত রঞ্জন সরকার
Professor of Commerce
NSOU

শ্রী তপন কুমার চৌধুরী
Associate Professor
NSOU

শ্রী সুদর্শন রায়
Assistant Professor
NSOU

: রচনা :

ড. বাপ্পাদিত্য বিশ্বাস
Assistant Professor
University of Calcutta

: সম্পাদনা:

ড. উত্তম কুমার দত্ত
Professor of *Commerce,*
NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :

শ্রী সুদর্শন রায়
Assistant Professor Commerce, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

UG - COMMERCE
(HCO)

ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থা
(Indian Financial System)
Course Code : CC-CO-09

পর্যায় 1

একক 1 ❐ আর্থিক ব্যবস্থা 07 – 22

একক 2 ❐ অর্থ এবং ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা 23 – 33

একক 3 ❐ অর্থ এবং ভারতীয় বাজার 34 – 41

একক 4 ❐ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া 42 – 54

পর্যায় 2

একক 5 ❐ টাকার বাজার 55 – 66

একক 6 ❐ মূলধনের বাজার I 67 – 75

একক 7 ❐ মূলধনের বাজার II 76 – 83

একক 8 ❐ আর্থিক পরিসেবা 84 – 101

❐ Suggest Readings 102

একক-1 ◆ আর্থিক ব্যবস্থা

গঠন

1.1 উদ্দেশ্য

1.2 প্রস্তাবনা

1.3 অর্থের সংজ্ঞা

1.4 আর্থিক ব্যবস্থার অর্থ

1.5 আর্থিক ব্যবস্থার তাৎপর্য বা গুরুত্ব

1.6 অর্থনীতিতে অর্থসংস্থানের ভূমিকা

1.7 আর্থিক ব্যবস্থার উপাদান

1.8 আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান

1.8.1 সংজ্ঞা

1.8.2 আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের প্রভারভেদ

1.8.3 আর্থিক মধ্যস্থতাকীর প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

1.9 ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো ও উপাদান

1.10 অনুশীলনী

1.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে —

- আর্থিক ব্যবস্থার অর্থ ও গুরুত্ব
- আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদান
- আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী
- ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার গঠন ও তার উপাদান

1.2 প্রস্তাবনা

অর্থের উৎপত্তি (Evolution of Money) :

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মানুষ অর্থ হিসাবে যেগুলি ব্যবহার করেছে তা খুবই

বৈচিত্রপূর্ণ। প্রাচীনকালে কোনো বিশেষ বস্তুকেই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হত। বিভিন্ন পশুপাখি, চাল, চা, তামাক, ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হত। অর্থাৎ এই সমস্ত বস্তুগুলিকে বিভিন্ন সময়ে মানুষ অর্থ হিসাবে ব্যবহার করত। কিন্তু এই বস্তুকে অর্থ হিসাবে ব্যবহার করার সময় নানাধরনের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। যেমন, এই সকল বস্তুগুলির সকল একক সমজাতীয় হয় না (যেমন সকল গরু বা সকল ছাগল সমজাতীয় নয়); সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বেশি, এক স্থান থেকে অপর স্থানে নিয়ে যাওয়ার সমস্যা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করার সমস্যা, প্রয়োজন অনুসারে যোগানের সমস্যা ইত্যাদি। পরবর্তীকালে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ঐ সমস্ত অসুবিধা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মানুষ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বেছে নেয় সোনা, রুপা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু।

প্রথম অবস্থায় মূল্যবান ধাতু সোনা ও রুপোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান ধাতুর (সোনা, রুপা ইত্যাদি) মূল্য বেশি ও স্থিতিশীল দাম ও সহজে চেনা সম্ভব বলেই সকলেই এই মূল্যবান ধাতু গ্রহণ করত। কিন্তু লেনদেনের জন্য মূল্যবান ধাতু বেশি পরিমাণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে হত এবং তা থেকে সূক্ষ্মভাবে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ধাতু কেটে সূক্ষ্মভাবে ওজন করে দ্রব্যের দাম দিতে হবে। এই অসুবিধা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পরবর্তীকালে শাসকের নামাঙ্কিত ধাতুমুদ্রার প্রচলন হল, অর্থাৎ মূল্যবান ধাতুখণ্ডের ওপর সীলমোহর দিয়ে ধাতুখণ্ডের মূল্য ঠিক করে দেওয়া হয়। একেই বলা হয় মুদ্রাঙ্কন (Coinage)। বিনিময়ের নির্দিষ্ট মাধ্যম হিসাবে কাজ করার প্রয়োজনীয় গুণ মূল্যবান ধাতু সোনা ও রুপার মধ্যে থাকায় সোনা ও রুপার মুদ্রাকে বলা হয় ধাতব মুদ্রা (Metalic Coin)।

ধাতব মুদ্রার পরবর্তী স্তরে অর্থ হিসাবে আসে কাগজী নোট বা কাগজীয় মুদ্রা (Paper Currency)। প্রকৃতপক্ষে কাগজী নোটের সৃষ্টি হয় স্বর্ণকারের রসিদ (Receipt) থেকে। প্রথমদিকে মূল্যবান ধাতু (সোনা, রুপা ইত্যাদি) এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার যে ঝুঁকি আছে (চুরি, ছিনতাই ইত্যাদি) তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য স্বর্ণকারের কাছে অনেকে মূল্যবান ধাতু সোনা গচ্ছিত রাখত। স্বর্ণকার সোনা জমা রেখে রসিত দিত। ঐ রসিদে প্রতিশ্রুতি থাকত ''চাহিবামাত্র সোনা ফেরৎ দেওয়া হবে''। পরবর্তীকালে দ্রব্যসামগ্রী লেনদেনের জন্য সোনা ব্যবহার না করে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেন হত স্বর্ণকারের রসিদের মাধ্যমে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই স্বর্ণকারের উপর আস্থা থাকায় এটি সম্ভবপর হত। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ স্বর্ণকারের রসিদ থেকেই সৃষ্টি হয় কাগজী নোটের। পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক সোনা জমা রেখে প্রতিশ্রুতিপত্র দিতে শুরু করে এবং ব্যাঙ্কই প্রথম কাগজী অর্থ প্রচলন করে।

1.3 অর্থের সংজ্ঞা (Definition of Money)

অধ্যাপক ক্রাউথার -এর মতে যে বস্তু বিনিময় কাজ বা দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসাবে সকলে গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে মূল্যের পরিমাপ ও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে সেই বস্তুকেই অর্থ বলে ["Money can be defined as anything that is generally acceptable as a means of exchange (i.e. as a means of setting debts) and at the same time acts as a measure and as a store of values."]।

অধ্যাপক সেয়ার্স -এর মতে দেনা-পাওনা মেটানোর কাজে যে বস্তু ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয় তাকেই

অর্থ বলা হয় ["Money is something that is widely accepted for the settlement of debts."]।

অতএব বলা যায়, একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট যুগে যে বস্তুকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সকলে গ্রহণ করে এবং মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, ঋণ পরিশোধের মাপকাঠি ও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে তাকে অর্থনীতিতে অর্থ বলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের অর্থ বা মুদ্রার প্রচলন আছে। যেমন ভারতবর্ষের অর্থ টাকা, ইংল্যান্ডের অর্থ পাউন্ড-স্টার্লিং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ ডলার, জাপানের অর্থ ইয়েন (Yen) নামে পরিচিত।

1.4 আর্থিক ব্যবস্থার অর্থ (Meaning of Financial System)

যে প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থার মাধ্যমে সঞ্চয় উদ্বৃত্ত ক্ষেত্র থেকে সঞ্চয় ঘাটতি ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদ বা তহবিল স্থানান্তর করা হয় তাকেই বলে আর্থিক ব্যবস্থা।

The Institute of Chartered Finacial Analyst of India (ICFAI) সংস্থার অনুযায়ী, ''আর্থিক ব্যবস্থা হল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাজার, নিয়ম ও আইনকানুন সমূহ, প্রথাসমূহ, অর্থ ব্যবস্থাপক, বিশ্লেষক, লেনদেন, আর্থিকদাবি ও দায়গুলির একটি সংমিশ্রণ।''

অধ্যাপক ভ্যান হোর্ন (Prof. Van Horne)-এর মতে, ''আর্থিক পদ্ধতি বা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল মোট সঞ্চয়কে দক্ষতার সঙ্গে সেইসব অর্থের ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যারা সেই সঞ্চয়কে হয় উপযুক্তভাবে প্রকৃত সম্পদে বিনিয়োগ করবে অথবা ভোগের জন্য ব্যবহার করবে।''

অধ্যাপক রবিনসন্ (Prof. Robinson)-এর মতে, ''আর্থিক ব্যবস্থার মূল কাজ হল নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা এবং বর্তমান সম্পদের উপাদানগুলোর মধ্যে পোর্টফোলিও বা লগ্নিপত্রের সামঞ্জস্যকরণের জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের একটা যোগসূত্র গড়ে তোলা।''

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আর্থিক ব্যবস্থা হল দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক উপাদান, আর্থিক বাজার ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক । অর্থাৎ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত আর্থিক কাজকর্ম বা সেবা যেগুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করে তাকে আর্থিক ব্যবস্থা বলে।

1.5 আর্থিক ব্যবস্থার তাৎপর্য বা গুরুত্ব (Significance of Fiancial System)

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে একটা সুঠাম আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত হয় না। সুঠাম আর্থিক ব্যবস্থার তাৎপর্য বা গুরুত্ব/উদ্দেশ্যগুলো নিচে আলোচনা করা হল :

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) : আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলত সঞ্চয়-বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। আর্থিক ব্যবস্থা সঞ্চয়কে একত্রিত করে এবং সঞ্চিত তহবিলকে সঠিকভাবে বিনিয়োগ করতে সাহায্য করে। সুতরাং সুঠাম

আর্থিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিও ত্বরান্বিত হয়।

২. **বিনিয়োগ (Investment) :** শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নতুন নতুন প্রকল্পে প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ওই অর্থ সরবরাহ করে থাকে। আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানগুলি সঞ্চয়কারীদের অর্থ সঠিকভাবে উচ্চ আয়যুক্ত প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে থাকে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় সংগ্রহ করে তাদের বিনিয়োগে নিশ্চয়তা প্রদান করা, সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া উল্লেখযোগ্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি করে থাকে।

৩. **মূলধন গঠন (Capital Formation) :** উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে অন্যতম উপকরণ হল মূলধন। এই মূলধনের সাহায্যে অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। অর্থকে বর্তমানে শুধুমাত্র মূলধন বলা হয় না, মানবিক মূলধনও উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মূলধনের অভাবে উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠান, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না। তাই মূলধন গঠন একান্ত প্রয়োজন। আর্থিক ব্যবস্থা মূলধন গঠনের মাধ্যমে যে-কোনো দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়। উন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার উন্নতশীল দেশের তুলনায় বেশি। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহারের জন্য মূলধনের পরিমাণ আরও বেশি করে প্রয়োজন হচ্ছে। আর্থিক বাজারের সক্রিয়তার মাধ্যমে এই কাজ অতি সহজে সম্ভব হয়।

৪. **সঞ্চয় যোজন/সমাবেশ (Mobilisation of Savings) :** বিভিন্ন মধ্যস্থকারীদের সাহায্যে এক ব্যাঙ্ক, বীমা সংস্থা, ইউনিট ট্রাস্ট বা মিউচুয়াল ট্রাস্ট, শেয়ার বাজার, নতুন বিলি-বাজার বা লগ্নিপত্রের বাজারের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থা সঞ্চয়কে যোজন বা একত্রিত করে। যে দেশের আর্থিক ব্যবস্থা যত উন্নত, সেই দেশের সঞ্চয় যোজন বা সমাবেশ বা একত্রীকরণের মাত্রাও তত বেশি হয়।

৫. **শিল্পীয় বিনিয়োগ (Industrial Investment) :** আর্থিক ব্যবস্থা বিচক্ষণ বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে এবং সঞ্চয়কে উদ্যোক্তাদের বা উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর কাছে স্থানান্তরিত করে উৎপাদনে সাহায্য করে। সুঠাম আর্থিক ব্যবস্থা আর্থিক উদ্ভাবন এবং নতুন প্রজন্মের আর্থিক কৌশল বা আর্থিক প্রযুক্তিতে সাহায্য করে। বিনিয়োগ প্রাথমিক বা মৌলিক, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অর্থের মাধ্যমে হতে পারে। বস্তুত, আর্থিক ব্যবস্থা সুঠাম হলে তবেই সঞ্চয় প্রণালী দক্ষ হয়ে ওঠে এবং শিল্পীয় বিনিয়োগের পথ সুগম হয়।

৬. **বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান (Rendering Different Types of Services) :** অনুন্নত দেশ তথা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আর্থিক লেনদেনের পদ্ধতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। এমনকি অনেক দেশেই বিনিময় ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। উন্নত দেশগুলিতে আর্থিক লেনদেন বিভিন্ন ধরনের আর্থিক উপকরণের দ্বারা সম্পাদিত হয়, যেমন— ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানে চেক, ব্যাঙ্ক ড্রাফট, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, এটিএম কার্ড, ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ সরাসরি অর্থ (Money) আদানপ্রদান না করে শুধুমাত্র কাগজপত্রের মাধ্যমে লেনদেন হয়ে থাকে। বর্তমানে ই-কমার্স ও ই-বিজনেস (e-commerce and e-business)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান সম্পন্ন হচ্ছে। উন্নত আর্থিক ব্যবস্থার এটি একটি বড়ো সাফল্য। এতে সময় ও ব্যয় সংক্ষেপ করা সম্ভব হয়েছে।

৭. **আর্থিক সহায়তা (Financial Assistance) :** বড়ো বড়ো শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের একার পক্ষে সেই পরিমাণ অর্থ জোগাড় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে অনেক সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা করার জন্য। শিল্প স্থাপন, শিল্প পুনর্গঠন সহায়তা করার জন্য ভারতের শিল্প অর্থ নিগম (IFCI), ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (IDBI), জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প নিগম (NSIC) ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলিকে উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়। সুতরাং, শিল্পক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। আর্থিক ব্যবস্থার এটি অন্যতম সাফল্য।

৮. **হস্তান্তর প্রক্রিয়া (Transfer Process) :** সঞ্চয় বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে হস্তান্তর প্রক্রিয়া বলে। মূলধন গঠনের মাত্রা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি নির্ভর করে হস্তান্তর প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার ওপর। আর্থিক ব্যবস্থা সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সেতুবন্ধন করে। সুঠাম আর্থিক ব্যবস্থা বহাল থাকলে সঞ্চয়-প্রবাহ উৎপাদনক্ষম বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয় এবং সঞ্চয়ের প্রবাহ ও বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। বিনিয়োগকে উৎপাদনক্ষম করতে পারে বিশেষ শ্রেণীর কারবার বা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদন কৌশল ও বাজারের ওপর যাদের পারদর্শিতা ও আধিপত্য থাকে এবং সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহারে যাদের উপযুক্ত মানসিকতা থাকে। হস্তান্তর সঞ্চয়কে উৎপাদনক্ষম বিনিয়োগে রূপান্তরিত করে।

৯. **জনসাধারণের আস্থা অর্জন (Gaining Public Confidence) :** একটি ব্যবস্থার মধ্যে যেমন অনেকগুলি উপ-ব্যবস্থা থাকে, তেমনই আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যেও অনেক উপ-ব্যবস্থা আছে। এই উপ-ব্যবস্থাগুলির কাজকর্ম, তাদের পরিচ্ছন্নতা, পারস্পরিক সম্পর্কের উপর আর্থিক ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নির্ভর করে। আর্থিক ব্যবস্থা যদি জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে না পারে তাহলে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ে ভাটা পড়ে যায়। যেমন আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থবিনিয়োগ করে জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যদি প্রতারিত হয় তাহলে তাদের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার উপর আস্থা নষ্ট হয়ে যায়।

১০. **সামাজিক সুরক্ষা (Social Security) :** বিমা কোম্পানি, বিনিয়োগ ট্রাস্ট জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছে। এর মধ্যে পেনশন প্রকল্প, প্রভিডেন্ট ফান্ড, জীবনবীমা, সামাজিক সুরক্ষা বিমা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের সরকারের পক্ষে হয়তো এই সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া সর্বদা সম্ভব হয় না। আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই কাজে সহায়ত করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

1.6 অর্থনীতিতে অর্থ সংস্থানের ভূমিকা (Role of Finance in an Economy)

অর্থনীতিতে বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মান, উৎপাদন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থসংস্থানের প্রয়োজন। তাই অর্থনীতিতে অর্থসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লেখযোগ্য ভূমিকাগুলি নিম্নরূপ :

১. **অর্থনীতির ক্ষেত্রভিত্তিক উন্নয়ন স্থায়ী উন্নয়ন (Sustained Growth in Different Sectors of the Economy) :** অর্থনীতিতে অর্থসংস্থানের মাধ্যমে মূলধন গঠনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে

দেশে স্থির/স্থায়ী মূলধন সৃষ্টি হয়, ভোগ্য দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটে, গবেষণা ও উন্নয়ন (Research & Development) এবং ক্রীড়া ও বিনোদনের মান উন্নত হয়। ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

২. **প্রয়োজনীয় স্থির মূলধনের উৎস (Sources of Fixed Capital Requirements) :** যে কোনো নতুন ব্যবসায়িক কাজের প্রচেষ্টার জন্য অর্থসংস্থান বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিল্প এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জমি, বাড়ি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থির সম্পত্তির ব্যয় মেটানোর জন্য স্থির মূলধনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। উন্নয়ন ব্যাঙ্কসমূহ স্থির মূলধনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে নতুন শিল্প একক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সাহায্য করে থাকে।

৩. **বিনিয়োগে প্রসার (Promotion of Investment) :** কোন একটি দেশের অর্থনীতিতে অর্থ বিনিয়োগের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নেয়। বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সম্পদ বা উপকরণের মাধ্যমে জনসাধারণ, প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ যেমন বিনিয়োগ করে তেমনি উচ্চ আয়ের উদ্দেশ্যে আর্থিক সম্পদেও বিনিয়োগ করে।

৪. **কার্যকরী মূলধনের উৎস (Source of Working Capital) :** অর্থের একটি অংশ হল কার্যকরী মূলধন। উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ক্রয় করতে হয় এবং মজুত করতে হয়, এর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। এছাড়া নানা ধরনের স্বল্পকালীন পাওনা মেটানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়।

৫. **বাণিজ্যের জীবনীশক্তি (Life Blood of Commerce) :** অর্থসংস্থানের প্রধান কাজ হল প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগানের মাধ্যমে শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি সাধন। প্রকৃতপক্ষে অর্থসংস্থান বাণিজ্যের জীবনীশক্তি হিসাবে কাজ করে, যার অভাবে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারে না।

৬. **সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান (Promotion of Savings) :** অর্থসংস্থান দেশের সঞ্চয় সৃষ্টিতেও উৎসাহ প্রদান করে থাকে। কারণ অর্থসংস্থান ব্যক্তি এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দ্বারা সে সমস্ত বিনিয়োগ হয়ে থাকে সেই সমস্ত বিনিয়োগের উপর সুদ ও মুনাফার মাধ্যমে আর্থিকভাবে উৎসাহ দিয়ে থাকে।

৭. **বিনিময়ের মাধ্যম ও পরিশোধের পদ্ধতি (Medium of Exchange and Payment Mechanism) :** কাঁচামাল, দ্রব্য ও সেবা ইত্যাদির ক্রয়বিক্রয়ে অর্থসংস্থান সাহায্য করে থাকে। উৎপাদন কাজের প্রচেষ্টা গ্রহণ সম্ভব নয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়া। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেনের পাওনা মেটাতেও এটি সাহায্য করে থাকে। সুতরাং পর্যাপ্ত অর্থসংস্থান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের বিনিময়ের মাধ্যম ও পরিশোধের পদ্ধতি হিসাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করে থাকে।

1.7 আর্থিক ব্যবস্থার উপাদান (Components of Financial System)

আর্থিক ব্যবস্থার পৃথক কোন সত্তা নেই। একটি দেশের জনসাধারণ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রভৃতি আর্থিক ব্যবস্থার অংশ বা উপাদান। মানুষের চাহিদার ও জ্ঞানের পরিধির পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আর্থিক উপাদানের উদ্ভাবন হচ্ছে।

আর্থিক ব্যবস্থার উপাদান বলতে আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদানকে বোঝায়। আর্থিক ব্যবস্থার উপাদানগুলোকে নিচে আলোচনা করা হল ঃ

আর্থিক ব্যবস্থার উপাদানগুলো হল আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক বাজার, আর্থিক দলিল ও আর্থিক পরিষেবা। আর্থিক ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর্থিক ব্যবস্থা দেশের সঞ্চয়কে পুঞ্জীভূত বা একত্রিত করে এবং পুঞ্জিত সঞ্চয়কে উৎপাদনের কাজে কার্যকরভাবে বিনিয়োগে সাহায্য করে। আর্থিক ব্যবস্থার যে সব উপ-পদ্ধতিগুলো কাজ করে তাদের আর্থিক ব্যবস্থার উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। আর্থিক ব্যবস্থার মূল পাঁচটি উপাদান হল—

১। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ,	২। আর্থিক বাজারসমূহ,	৩। আর্থিক দলিলপত্র,
৪। আর্থিক পরিষেবা এবং	৫। আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রক।	

নিচে আর্থিক ব্যবস্থার পাঁচটি উপাদান আলোচনা করা হল ঃ

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (Financial Institutions) : আর্থিক মধ্যস্থকারবারীরাই আর্থিক ব্যবস্থার আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এইসব মধ্যস্থকারবারীরা দেশের সঞ্চয়কে একত্রিত করে এবং পুঞ্জিত ফান্ড বা তহবিলকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে বিনিয়োগ বা বণ্টন করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক-বহির্ভূত অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হতে পারে। ব্যাঙ্ক ঋণ সৃষ্টি করে এবং ব্যাঙ্ক-বহির্ভূত অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ সৃষ্ট অর্থকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে বিনিয়োগ করে। ভারতে ব্যাঙ্ক-বহির্ভূত অর্থ-লগ্নিকারী সংস্থাগুলো হল— উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, গৃহনির্মাণ অর্থ-লগ্নিকারী কোম্পানী, IDBI, ICICI, IFCI, IIBI, SIDBI, SFCs, SIDCs, EXIM Bank, NABARD, ইত্যাদি।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড, যেমন ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, বীমা প্রতিষ্ঠান, যেমন জীবন বীমা নিগম (LIC) সাধারণ বীমা নিগম (GIC) ইত্যাদিও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

২. আর্থিক বাজার (Financial Market : আর্থিক বাজার হল এমন স্থান বা সংযোগকারী যেটি আর্থিক সম্পত্তি ও সেবা ক্রয় এবং বিক্রয় যথাযথ সহায়তা দিয়ে থাকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে যে বাজারে আর্থিক সম্পত্তি বা বিষয় লেনদেন করা হয় তাকে আর্থিক বাজার বলে। তবে এই বাজারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্দিষ্ট স্থান ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন প্রণালীর মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতার কাছে আর্থিক সম্পদ পৌঁছে দেয়। বিভিন্ন কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকার সরাসরি যেমন আর্থিক দাবিপত্র বা সম্পদ বিক্রি করে আবার তেমনই দালাল বা ব্রোকারদের মাধ্যমেও এই পরিসেবা দিয়ে থাকে।

আর্থিক বাজারকে প্রধানত দু-ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন— ক) টাকার বাজার (Money Market) এবং খ) মূলধনের বাজার (Capital Market)।

আর্থিক বাজারের যে অংশে স্বল্পমেয়াদি অর্থাৎ এক বছরের কম মেয়াদি আর্থিক দাবিপত্র বা ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় হয় অথবা তার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয় তাকে টাকার বাজার বলে। টাকার বাজার সংগঠিত ও অসংগঠিত দু-ধরনের হয়। সংগঠিত টাকার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক প্রধানত অংশগ্রহণ করে, অন্যদিকে মহাজন, শেঠ, সাহুকার অসংগঠিত বাজারে অংশগ্রহণ করে। সংগঠিত টাকার বাজারের অন্যান্য

অংশ হল— 1) তলবি টাকার বাজার (Call Money Market), 2) ট্রেজারি বিল বাজার (Treasury Bill Market), 3) সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটের বাজার (Certificate of Deposits Market), 4) বাণিজ্যিক কাগজের বাজার (Commercial Paper Market)।

আর্থিক বাজারের যে অংশে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক দাবিপত্র বা সম্পদের লেনদেন হয় এবং যার দ্বারা কারবারি প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য দীর্ঘকালের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারে সেই বাজারকে মূলধনের বাজার বলে। মূলধনের বাজারকে প্রধানত দু-ভাগে ভাগ করা হয়— 1) প্রাথমিক বাজার (Primary Market) এবং 2) গৌণ বাজার (Secondary Market)।

৩. আর্থিক উপকরণ বা আর্থিক সম্পদ (Financial Instruments or Financial Assets) : আর্থিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম উপাদান আর্থিক উপকরণ বা আর্থিক সম্পদ। এই উপাদানটি অন্যান্য উপাদানের সংযোগরক্ষাকারী হিসাবে বিশেষ সম্পর্কিত। আর্থিক সম্পত্তি হল এমন এক ধরনের দাবিপত্র যারা দ্বারা ভবিষ্যতে আয় অর্জনের সম্ভাবনা থাকে তা সেটি একবারের জন্য হতে পারে আবার একাধিকবার অথবা নির্দিষ্ট সময় পর পর হতে পারে।

আর্থিক উপকরণ বা সম্পত্তিগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন— 1) টাকার বাজারের উপকরণ এবং 2) মূলধনের বাজারের উপকরণ। টাকার বাজারের উপকরণ হল স্বল্পমেয়াদি আর্থিক উপকরণ বা সম্পদ, যার পরিশোধ যোগ্যতার সময় এক বছরের কম। এই ধরনের সম্পদকে স্বল্পমেয়াদি উপকরণও বলা হয়, উদাহরণ— i) তলবি ঋণ (Call Loan), ii) ট্রেজারি বিল (Treasury Bill), iii) বিল পুনর্বাট্টাকরণ প্রকল্প (Bill Rediscounting Scheme), iv) সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট (Certificate of Deposit), v) বাণিজ্যিক কাগজ (Commercial Paper) এবং vi) ফিন্যান্সিয়াল ফিউচার (Financial Future)।

মূলধনের বাজারে যে সমস্ত আর্থিক-সম্পত্তি বা উপকরণগুলি দীর্ঘকালীন মূলধন সংগ্রহের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বাজারের উপকরণ বলে। মূলধনের বাজারের উপকরণ প্রধান দু-ধরনের— 1) প্রত্যক্ষ (Direct) এবং 2) উদ্ভূত (Derivative)। প্রত্যক্ষ মূলধনের বাজারের উপকরণ হল — i) ইক্যুইটি শেয়ার (Equity Share), ii) প্রেফারেন্স শেয়ার (Preference Share), iii) কোম্পানি ফিক্সড ডিপোজিট (Company Fixed Deposit), iv) ডিবেঞ্চার ও বন্ড (Debenture and Bond)।

৪. আর্থিক পরিষেবা (Financial Services) : যে কোনো দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আর্থিক পরিষেবা। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনিয়োগকারী ও কারবারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে বিভিন্ন ধরনের অর্থসংক্রান্ত পরিষেবা বা সেবাপ্রদান করে তাকে বলে আর্থিক পরিষেবা। আর্থিক পরিষেবা সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং আর্থিক ব্যবস্থার গতিশীলতা সুনিশ্চিত করে। আর্থিক পরিষেবা মূলত দুধরনের হতে পারে একটি হল ফান্ড ভিত্তিক বা সম্পদ ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা (Fund Based or Asset Based Financial Services) এবং অপরটি হল ফি ভিত্তিক বা উপদেশ ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা (Fee Based or Advisory Based Fiancial Services)। আর্থিক পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিল্প সংস্থায় পরোক্ষভাবে বিকল্প মূলধনের যোগান সুনিশ্চিত করা, উদ্যোগ মূলধন সরবরাহ, আর্থিক উপদেশ প্রদান, বাণিজ্যিক হুণ্ডির পুনর্বাট্টাকরণ ইত্যাদি।

যে সমস্ত আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান অর্থ, সম্পদ ও ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে তাকে ফান্ড বা সম্পদ ভিত্তিক আর্থিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বলে।

উদাহরণ : i) বীমা প্রতিষ্ঠান (Insurance organisation), ii) উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (Venture Capital Financing Institution), iii) গৃহ নির্মানে অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান (Housing Finance Institutiion), ইত্যাদি।

যে সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের বিনিময়ে ফি ধার্য করে সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে ফি বা উপদেশ ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা বলে।

উদাহরণ : i) মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার (Marchent Banker) ii) কোম্পানীর পরামর্শদানকারী প্রতিষ্ঠান (Corporate Counseling Institution) iii) মূলধন পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠান (Capital Reconstruction Institution) প্রভৃতি।

৫. আর্থিক নিয়ন্ত্রক (Fincial Regulator) : আর্থিক ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আর্থিক নিয়ন্ত্রকসমূহ। যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আর্থিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলে আর্থিক নিয়ন্ত্রক। আর্থিক ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আর্থিক ব্যবস্থার যে বিভিন্ন উপাদান আছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন। আর্থিক ব্যবস্থার আর্থিক নিয়ন্ত্রকদের প্রধান উদ্দেশ্য হল আর্থিক বাজার ও আর্থিক কার্যাবলীর স্বচ্ছতা বজায় রাখা, আর্থিক বাজারের উপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা সৃষ্টি করা, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, অর্থের বাজার ও মূলধন বাজারের আর্থিক কেলেঙ্কারী প্রতিরোধ করা ইত্যাদি।

উদাহরণ i) ভারতবর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (RBI) যেমন ব্যাঙ্কিং কার্যাবলি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে তদারকি করে।

ii) শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে সিকিউরিটজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইণ্ডিয়া, (SEBI)।

iii) বীমাক্ষেত্রে ইনশিয়োরেন্স রেগুলিটেরি এ্যাণ্ড ডেভলপমেন্ট অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া (IRDA) ইত্যাদি।

1.8 আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Financial Intermediaries)

1.8.1 সংজ্ঞা (Definition) :

যে সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান উদ্বৃত্ত অর্থনৈতিক একক থেকে ঘাটতি অর্থনৈতিক এককে উদ্বৃত্ত অর্থের প্রবাহ (flow) কে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে অথবা ঘাটতি একক (Deficit unit) এবং উদ্বৃত্ত এককের (Surplus units) মধ্যে সমন্বয়/সংযোজনা সাধন করে তাদের মধ্যস্থকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলে।

মধ্যস্থকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুসংহত আর্থিক ব্যবস্থা এবং সুসংগঠিত আর্থিক বাজারের মাধ্যমে তাদের আর্থিক সমন্বয়ের কাজগুলো সম্পাদন করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হল মধ্যস্থকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

1.8.2 আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ (Types of Financial Intermediary Institution)

মধ্যস্থকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান দু'ধরনের হতে পারে, যেমন—

১. ব্যাঙ্কিং মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Banking Intermediary Institutions) : ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারী আর্থিক সংস্থা হিসাবে কাজ করে। ব্যাঙ্ক জনগণের কাছ থেকে আমানত (Deposits) গ্রহণ করে এবং ঋণ সৃষ্টি করে। ঋণ বিভিন্ন প্রকারে দেওয়া হয়, যেমন— লোন (Loan) রোক ঋণ (Cash Credit) জমাতিরিক্ত উত্তোলন (Overdraft) ইত্যাদি। ব্যাঙ্ক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানদের ঋণ দেয়। ব্যাঙ্ক এমন ধরনের আর্থিক মধ্যস্থকারী সংস্থা যা নগদ অর্থকে আমানতে এবং আমানতকে নগদ অর্থে চক্রাকারে (Cyclincal order) আবর্তন করতে থাকে। SBI, United Bank of India, Bank of India, UCO Bank, PNB, ICICI Bank, HDFC Bank ইত্যাদির মত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, W.B. State Co-operative ব্যাঙ্কের মত সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, ABN-Amro Bank, Standard Chartered Bank, HSBC Bank ইত্যাদির মত বিনিময় ব্যাঙ্কগুলো মধ্যস্থকারী ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।

২. ব্যাঙ্ক-বহির্ভূত মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Non-banking Financial Intermediary Institution) : ব্যাঙ্ক ব্যতিত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান যারা অর্থ মূলধনের বাজারে মধ্যস্থ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে তাদের ব্যাঙ্ক-বহির্ভূত মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান বলে। এরা সঞ্চয়কারীদের কাজ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যে মধ্য-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাঙ্ক-বহির্ভূত মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হল— বীমা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

1.8.3 আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী (Function of Financial Intermediary Institution)

আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি নানাধরনের কার্যাবলী বা ভূমিকা সম্পাদন করে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি আলোচনা করা হল ঃ

১. মূলধন গঠন (Capital Formation) : উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মূলধন। আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্প বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন মূলধনের যোগান দিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি মধ্যস্থতাকারীর কাজ করে সঞ্চয়কে যথাযথভাবে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন গঠনে সাহায্য করে থাকে।

২. ছোট ছোট এককে বিনিয়োগ (Investment in Small Units) : আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি (যেমন মিউচ্যুয়াল ফান্ড) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে লগ্নিপত্র বিক্রয় করে থাকে। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের পক্ষে বিনিয়োগ সম্ভব হয়ে ওঠে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাজের ফলেই ছোট ছোট সঞ্চয়কারীদের স্বল্প সঞ্চয় দক্ষতার সঙ্গে লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্ভব নয়।

৩. সম্পদসমূহের চলাচল (Mobilisation of Resources) : আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি

বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়, ব্যাঙ্ক আমানত, বিল বাজারের সম্পদ, বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদি একত্রিত করে এই সমস্ত আর্থিক সম্পদকে বিনিয়োগকারীদের হাতে পৌঁছে দেয়। এইভাবে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পদ সমূহের চলাচলের মাধ্যমে সঞ্চয় প্রবাহ অব্যাহত রেখে বিনিয়োগে সাহায্য করে থাকে।

৪. **নমনীয়তা (Flexibility) :** সঞ্চয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি লগ্নিপত্রগুলিকে সঞ্চয়কারীদের ব্যক্তিগত সুবিধামত বিভিন্ন এককে ভাগ করে বিভিন্ন মূল্যের লগ্নিপত্রের ব্যবস্থা করায় সঞ্চয়কারীরা নমনীয়তার সুবিধা পায়।

৫. **ঝুঁকি হ্রাস (Minimum Risk) :** সরাসরি প্রাথমিক বাজার বা গৌন বাজার থেকে লগ্নিপত্র ক্রয় করলে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকির মাত্রা অনেক বেশী থাকে কারণ এই সব বাজারে লগ্নিপত্রের দাম ভীষণ ভাবে ওঠা-নামা করে। মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগের ঝুঁকির মাত্রা অনেকটাই কমতে সাহায্য করে নির্দিষ্ট (Fixed) আয়ের বিনিয়োগপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে।

৬. **দক্ষ ব্যবস্থাপনা (Expert Management) :** বড় বিনিয়োগকারীরা দক্ষ ফান্ড ম্যানেজার, অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে বিনিয়োগ করতে পারে। তাছাড়া বিনিয়োগ-সংক্রান্ত বিভিন্ন ট্রেনিং, সেমিনারে তারা অংশগ্রহণ করে পরিস্থিতি জানতে পারে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর পক্ষে এই কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তারা মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান যেহেতু দক্ষ ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, সেহেতু তারা বিনিয়োগকারীদের অর্থের সঠিক প্রতিদান দিতে সর্বদা চেষ্টা করে।

৭. **ব্যয় সঙ্কোচ (Economics of Expenditure) :** আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান যেহেতু ফান্ড ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে সেহেতু বিনিয়োগ ব্যয় (Investment Cost) সঙ্কোচের দিকে সর্বদা দৃষ্টি দেয়। সঞ্চয়কারীদের অর্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের সময় খরচ যাতে বেশি না হয়, বিভিন্ন কম মূল্যের লগ্নিপত্রে বিনিয়োগকারীরা যাতে অর্থ বিনিয়োগের আনুষঙ্গিক ব্যয়ের শিকার না হয় এই প্রতিষ্ঠানগুলি সেইসব দিক বিবেচনা করে কাজ করে।

৮. **সঞ্চয়ের প্রবাহ (Channelisation of Savings) :** আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ের প্রবাহে সহযোগিতা করে তা নয়, শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান করে, যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সাহায্য করে, বৈদেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, বিনিয়োগ, অনাবাসী ভারতীয়দের বিনিয়োগ উৎসাহ প্রদানে সহায়তা করে সঞ্চয়ের গতিপ্রবাহকে অব্যাহত রাখে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank) আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থার (International Fianance Corporation) সঙ্গে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (IDBI) ভারতের শিল্প অর্থ নিগম লিমিটেড (IFCI) ভারতের শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ নিগম লিমিটেড (ICICI) শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থ আদান-প্রদানের ব্যাপারে সহায়তা করে।

1.9 ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো ও উপাদান (Structure of Indian Financial System)

বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত আর্থিক কাজকর্ম বা সেবা যেগুলি একে

অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করে তাকে বলে আর্থিক ব্যবস্থা। যে কোনো দেশের আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো সেই দেশের আর্থিক উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রকৃত অর্থে আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে বলা হয় আর্থিক ব্যবস্থার উপাদান। গঠনগত দিক থেকে বিভিন্ন দেশে আর্থিক ব্যবস্থার উপাদানগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মূল উপাদানগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। তাই ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার উপাদানগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল। এই পাঁচটি ভাগ হল :

১. ভারতের আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Financial Institutions of India)

২. ভারতের আর্থিক বাজার (Financial Markets of India)

৩. ভারতের আর্থিক উপকরণ বা আর্থিক দলিলপত্র বা আর্থিক সম্পদ (Financial Instruments or Financial Assets of India)

৪. ভারতের আর্থিক পরিষেবা (Financial Services of India)

৫. ভারতের আর্থিক নিয়ন্ত্রক (Financial Regulator of India)

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো ও উপাদান নিচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল :

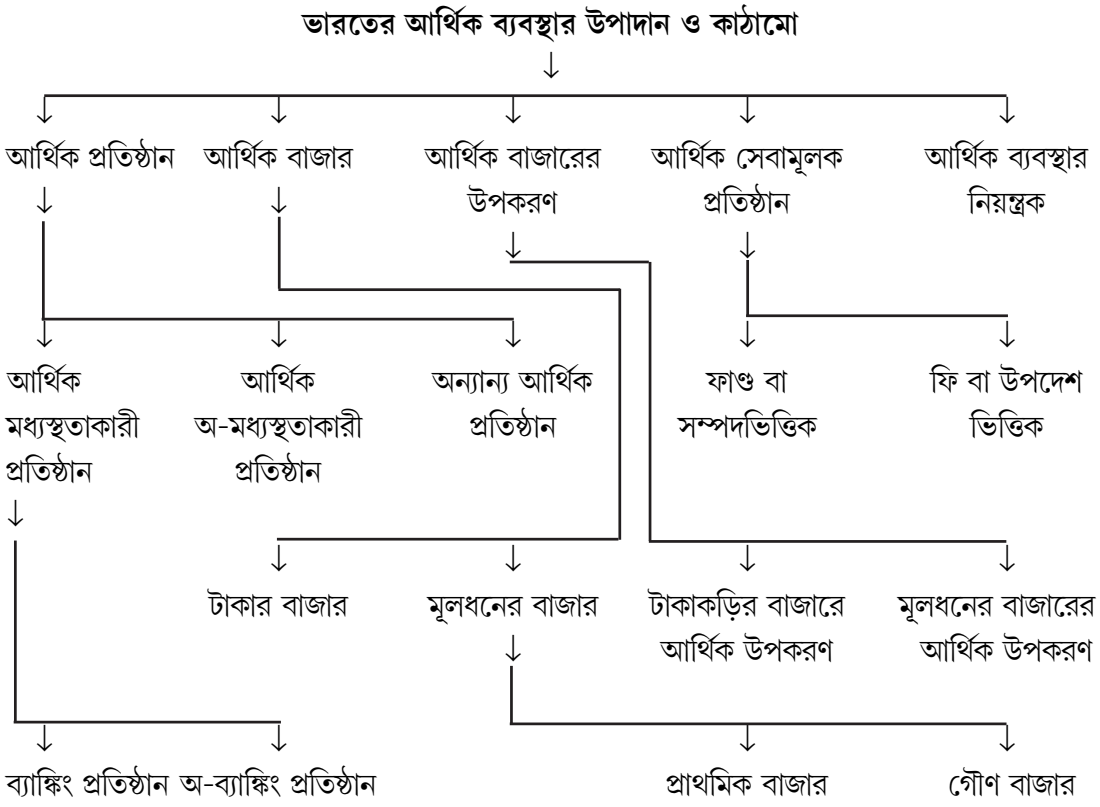

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার এই পাঁচটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. ভারতের আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Financial Institutions of India) : যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আর্থিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাদের সাধারণভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলে। অর্থাৎ আর্থিক ও মূলধন জাতীয় লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে বলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

ভারতের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

A. আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান বা অর্থসংক্রান্ত মধ্যবর্তী সংস্থা (Fianancial Intermediary Institutions or Financial Intermediary)।

আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. ব্যাঙ্কিং মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Banking Intermediary Institution)। যেমন i) রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, ii) বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, iii) বিদেশি ব্যাঙ্ক, iv) আঞ্চলিক গ্রামীণ বাঙ্ক, v) তালিকাভূক্ত সমবায় ব্যাঙ্ক, vi) বিনিময় ব্যাঙ্ক vii) জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

খ. অ-ব্যাঙ্কিং মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Non-Banking Intermediary Institution)। যেমন i) ভারতীয় জীবনবীমা কর্পোরেশন, ii) ভারতের সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, iii) ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট, iv) বিনিয়োগ ট্রাস্ট, v) মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইত্যাদি।

B. আর্থিক অ-মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Financial Non-Intermediary Institution)। যেমন i) ভারতের শিল্প অর্থ কর্পোরেশন, ii) ভারতের শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন, iii) ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, iv) ভারতের আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্ক, ৫ কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক বা নাবার্ড ইত্যাদি।

C. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Other Financial Institution)। যেমন i) এক্সপোর্ট ক্রেডিট অ্যান্ড গ্যারান্টি কর্পোরেশন অফ্ ইন্ডিয়া, ii) ডিপোজিট ইনসিওরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন অফ্ ইন্ডিয়া, iii) টেকনিক্যাল কনসালট্যান্সি অর্গানাইজেশন অফ্ ইন্ডিয়া ইত্যাদি।

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী বা সেবা সম্পাদন করে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আর্থিক সম্পদের রুপান্তর, আর্থিক সম্পদের বিনিময়, নতুন সম্পদ সৃষ্টি, আর্থিক সম্পত্তি হস্তান্তরে সাহায্য, বিনিয়োগকারীদের উপদেশ প্রদান, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, আর্থিক স্থায়িত্ব বজায়ে সাহায্য, আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রণ, ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম সম্পাদন ইত্যাদি।

২. ভারতের আর্থিক বাজার (Financial Markets in India) :

উন্নত দেশের আর্থিক বাজারের মতোই ভারতের আর্থিক বাজার দু'ধরনের— i) টাকার বাজার এবং ii) মূলধনের বাজর।

i) টাকার বাজার (Money Market)

স্বল্পমেয়াদী আর্থিক সম্পদ ও লগ্নিপত্র আর্থিক বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। ভারতের টাকার বাজার সংগঠিত ও অসংগঠিত দু'ভাবেই দেখা যায়।

টাকার বাজার

↓

সংগঠিত অসংগঠিত

সংগঠিত অংশে আছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি। অন্যদিকে টাকার বাজারের অসংগঠিত অংশে শেঠ, স্রফ, সাহুকর এবং গ্রাম্য মহাজন আছে। টাকার বাজারের এই অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

ii) মূলধনের বাজার (Capital Market)

ভারতের মূলধনের বাজারের প্রধান কাজ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া। ভারতের মূলধনের বাজারকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

ভারতের মূলধনের বাজার

↓

প্রাথমিক বাজার গৌণ বাজার

এছাড়া ডেরিভেটিভ বাজার (Derivative Market) মূলধনের বাজারে প্রবর্তিত হয়েছে।

১. প্রাথমিক বাজার (Primary Market) : প্রাথমিক বাজারকে নতুন শেয়ার বিলির বাজার বলে। ভারতীয় কোম্পানিগুলি যখন শেয়ার বিলির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে তখন প্রাথমিক বাজারে জনসাধারণের কাছে তা বিক্রয় করে।

২. গৌণ বাজার (Secondary Market) : গৌণ বাজার হল প্রকৃতপক্ষে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার। ভারতের বিভিন্ন শহরে শেয়ার বাজার আছে।

ভারতের মূলধন বাজারে বিভিন্ন মুখ্য লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হল— ১) বিনিয়োগ ট্রাস্ট (Investment Trust) ২) ভারতীয় জীবন বীমা নিগম (Life Insurance Corporation of India)।

৩. ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায় আর্থিক উপকরণ (Financial Instruments in Indian Financial System) :

আর্থিক ব্যবস্থায় সঞ্চয় বিনিয়োগ ও অন্যান্য লেনদেন যে সকল আর্থিক দাবিপত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে সেগুলিকে আর্থিক উপকরণ বলে। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায় আর্থিক উপকরণগুলি দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়—

আর্থিক উপকরণ

↓

টাকাকড়ির বাজারে আর্থিক উপকরণ মূলধনের বাজারে আর্থিক উপকরণ

i) টাকাকড়ির বাজারে আর্থিক উপকরণ (Financial Instruments in Money Market) : ভারতের টাকাকড়ির বাজারে উল্লেখযোগ্য আর্থিক উপকরণগুলি হল :

১. ট্রেজারি বিল (Treasury Bill)।
২. বাণিজ্যিক বিল (Commercial Bill)।
৩. বাণিজ্যিক ঋণ (Trade Credit)।
৪. চিটস (Chits)।
৫. বাণিজ্যিক কাগজ (Commercial Papers)।
৬. সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটস (Certificate of Deposits)।

উপরোক্ত উপাদানগুলি সাধরণত স্বল্পমেয়াদী আর্থিক উপকরণ।

ii) মূলধনের বাজারে আর্থিক উপকরণ (Financial Instruments in Capital Market) : ভারতের মূলধনের বাজারে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় হয়। মূলধনের সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি এইসব আর্থিক উপকরণ বিক্রয় করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১. ইক্যুইটি শেয়ার (Equity Share)।
২. প্রেফারেন্স শেয়ার (Preference Share)।
৩. শিল্পের ঋণপত্র বা বন্ড (Industrial Debenture or Bond)।
৪. মূলধনী আয় বন্ড (Capital Gain Bond)।
৫. রিলিফ বন্ড (Relief Bond)।
৬. জাতীয় উন্নয়ন বন্ড (National Development Bond) প্রভৃতি।

৪. ভারতের আর্থিক পরিষেবা বা সেবা (Financial Services of India) :

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনিয়োগকারী ও কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে বিভিন্ন ধরনের অর্থসংক্রান্ত পরিষেবা বা সেবা প্রদান করে তাকে বলে আর্থিক পরিষেবা বা আর্থিক সেবা। ভারতের আর্থিক পরিষেবা বা আর্থিক সেবা সাধারণত দুই ধরনের।

ক) ফান্ড ভিত্তিক বা তহবিল ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা বা আর্থিক সেবা।

যেমন **i) ইজারাদারী (Leasing) :** এই পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হল : ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিজিং অ্যান্ড ফিনানসিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, অগ্রণী জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কসমূহ, গৃহ উন্নয়ন অর্থ নিগম ইত্যাদি।

ii) ভাড়া ক্রয় ব্যবস্থা (Hire Purchasing) : এই পরিষেবা প্রদানকারী উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল : রাজ্য শিল্প নিগমসমূহ, কৃষি-শিল্প নিগম ইত্যাদি।

iii) ঋণ দালালী পরিষেবা বা সেবা (Broking) : এই পরিষেবা প্রদানের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল : স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া, কমার্শিয়াল অ্যান্ড ফ্যাক্টরিং সার্ভিসেস লিমিটেড, কানাডা ব্যাঙ্কের কানাডা ফ্যাক্টর্স লিমিটেড ইত্যাদি।

iv) বিল বা হুণ্ডির বাট্টাকরণ (Bill Discounting) : এই পরিষেবা প্রদানের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল : ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

v) উদ্যোগ মূলধন তহবিল ((Venture Capital Fund) : এই পরিষেবা প্রদানের প্রতিষ্ঠানগুলি হল ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, ভারতের শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন, ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট ইত্যাদি।

vi) বীমা পরিষেবা বা বীমা সেবা (Insurance Service) : এই পরিষেবা প্রদানের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল : ভারতীয় জীবন বীমা কর্পোরেশন, ভারতের সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ইত্যাদি।

খ) ফি ভিত্তিক বা দর্শনী ভিত্তিক বা উপদেশ ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা বা আর্থিক সেবা।

যেমন i) শেয়ার বিলি ব্যবস্থাপনা, ii) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, iii) সওদাগরী ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, iv) কোম্পানীর প্রতিষ্ঠানগুলি পরামর্শ প্রদান, v) একত্রীকরণ এবং অধিগ্রহণ, vi) মূলধন পুনঃগঠন। এই সমস্ত পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া ক্যাপিটাল লিমিটেড, কানাডা ব্যাঙ্ক ফিনানসিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদা ফিসক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড, জে. এম. ফিনানসিয়াল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড, ইত্যাদি।

ভারতের আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং আর্থিক ব্যবস্থার গতিশীলতা আনতে সচেষ্ট থাকে।

৫. ভারতের আর্থিক নিয়ন্ত্রক (Financial Regulator of India) : যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আর্থিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রন করে তাকে বলে আর্থিক নিয়ন্ত্রক। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আর্থিক নিয়ন্ত্রকসমূহ। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য আর্থিক নিয়ন্ত্রকসমূহ হল :

i) ভারতের অর্থমন্ত্রক (Indian Ministry of Finance, Government of India)
ii) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India)
iii) সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ্ ইন্ডিয়া (Securities and Exchange Board of India : SEBI)
iv) ইন্সিওরেন্স রেগুলেটারি অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (Insurance Regulatory and Development Authority : IRDA)

1.10 অনুশীলনী

1. আর্থিক ব্যবস্থা কাকে বলে?
2. আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
3. অর্থনীতিতে অর্থ সংস্থানের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
4. আর্থিক মধ্যস্থাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কাদের বোঝায়?
5. আর্থিক মধ্যস্থাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
6. ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামোটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

একক -2 ◆ অর্থ এবং ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

গঠন

2.1 উদ্দেশ্য

2.2 প্রস্তাবনা

2.3 অর্থের সংজ্ঞা

2.4 অর্থের কাজ বা ভূমিকা

2.5 ভারতের অর্থ যোগানের পরিমান নির্ধারণের বিকল্প পদ্ধতিসমূহ এবং তার বিভিন্ন উপাদান

2.6 অর্থের উপাদান

2.7 উচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত অর্থ : ধারণা ও গুরুত্ব

2.8 অর্থের গুণক

2.9 অনুশীলনী

2.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পরে জানা যাবে –

- অর্থের ধারনা ও কার্যাবলী
- অর্থের যোগানের পরিমান নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ
- উচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত অর্থের ধারণা
- অর্থের গুণক এর ধারণা ও পরিমান পদ্ধতি

2.2 প্রস্তাবনা

আধুনিক অর্থনৈতিক জীবনে অর্থের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের প্রতিটি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় করতে ব্যস্ত থাকে। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন মানুষের জীবনযাত্রায় অর্থের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করাই হল অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়। আধুনিককালে অর্থের গুরুত্ব এতই বেড়েছে যে আধুনিক অর্থব্যবস্থাকে অর্থভিত্তিক অর্থব্যবস্থা (Money based Economy) বলে অভিহিত করা হচ্ছে।

2.3 অর্থের সংজ্ঞা

অর্থের সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধ্যাপক ক্রোথার এর মতে, ‘যে বস্তু বিনিময় কাজ বা দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসাবে সকলে গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে মূল্যের পরিমাপ ও

সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে সেই বস্তুকেই অর্থ বলে'।

অধ্যাপক সেয়ার্স -এর 'মতে, দেনা-পাওনা মেটানোর কাজে যে বস্তু ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয় তাকেই অর্থ বলা হয়।'

সুতরাং অর্থনীতিবিদরা অর্থের সংজ্ঞা প্রত্যক্ষভাবে না দিয়ে পরোক্ষভাবে দিয়েছেন অর্থের কাজের ভিত্তিতে। এইজন্যই বলা হয়, যা কিছু অর্থের কাজ সম্পাদন করে তাকেই অর্থ বলে। অতএব বলা যায়, একটি দেশের নির্দিষ্ট যুগে যে বস্তুকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সকলে গ্রহণ করে এবং মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, ঋণ পরিশোধের মাপকাঠি ও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে তাকে অর্থনীতিতে অর্থ বলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের অর্থ বা মুদ্রার প্রচলন আছে। যেমন ভারতবর্ষের অর্থ টাকা, ইংল্যান্ডের অর্থ পাউন্ড-স্টার্লিং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ ডলার, জাপানের অর্থ ইয়েন নামে পরিচিত।

2.4 অর্থের কাজ বা ভূমিকা

১. **বিনিময় ও পরিশোধের মাধ্যম :** টাকাকড়ি যেমন দ্রব্যের বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে তেমনি অর্থ বৃহত্তরভাবে ক্রয় ও বিক্রয়ের, তা সে কাঁচামাল, পণ্য, সেবা যাই হোক না কেন তার বিনিময়ে ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেনের পরিশোধে সহায়তা করে।

২. **বিনিয়োগে প্রসার :** কোন একটি দেশের অর্থনীতিতে অর্থ বিনিয়োগের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নেয়। বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সম্পদ বা উপকরণের মাধ্যমে জনসাধারণ, প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ যেমন বিনিয়োগ করে তেমনি উচ্চ আয়ের উদ্দেশ্যে আর্থিক সম্পদেও বিনিয়োগ করে।

৩. **বাণিজ্যের প্রাণশক্তি :** টাকাকড়ি ভিন্ন কোন ব্যবসা সম্ভব নয়। অর্থনীতিতে, বাণিজ্যে ও শিল্পে অর্থ মূলধন সরবরাহের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। সেজন্য বলা হয় অর্থ ছাড়া ব্যবসায়িক কার্যকলাপ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

৪. **মূল্যের ভাণ্ডার :** জনসাধারণ যেহেতু তাদের সঞ্চয় অর্থের মাধ্যমে রাখতে চায়, সেহেতু অর্থ সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। অর্থ ব্যবহার করা হলে কোন ব্যক্তি তার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে যে অর্থ পায় তা দিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন দ্রব্য কেনার দরকার হয় না। অর্থের একটি অংশ সে সঞ্চয়ও করতে পারে। তাই অর্থনীতিতে অর্থ সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

৫. **কার্যকরী মূলধনের উৎস :** অর্থের একটি অংশ হল কার্যকরী মূলধন। উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ক্রয় করতে হয় এবং মজুত করতে হয় এর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। এছাড়া নানা ধরনের স্বল্পকালীন পাওনা মেটানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়।

৬. **ভবিষ্যৎ লেনদেন :** আধুনিক ব্যবসায়িক জগতে ভবিষ্যৎ লেনদেনের হার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যৎ লেনদেন বলতে বোঝায় বর্তমান চুক্তি করে ভবিষ্যতে লেনদেনের দাম স্থির করা। সেহেতু কোন দ্রব্য উৎপাদনের ভবিষ্যৎ মূল্যের পরিমাপক হিসেবে অর্থনীতিতে অর্থ ব্যবহার করা হয়।

৭. **অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কোন দেশের জাতীয় আয় তথা মাথাপিছু আয়ের ক্রমবর্ধমান গতিধারাকে বোঝায়, কোন দেশের মাথাপিছু আয় যদি বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে ঐ দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে এটা সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়। যদিও অর্থনৈতিক বিকাশ অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তথাপি ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক বিকাশের হার অনেকটাই মূলধন গঠনের উপর নির্ভরশীল। তাই অর্থনীতিতে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. **আর্থিক সম্পদ যোগান :** ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সরকারের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কার্যকলাপে অর্থ আর্থিক সম্পদ যোগান দিয়ে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আর্থিক সম্পদ ব্যবসা ও শিল্প পরিচালনায় সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান শেয়ার ডিবেঞ্চার, বন্ড ও বিভিন্ন ধরনের সম্পদ বিলি করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

2.5 ভারতের অর্থ যোগানের পরিমাণ নির্ধারণের বিকল্প পদ্ধতিসমূহ এবং তার বিভিন্ন উপাদান

অর্থের যোগান পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, কারণ অর্থ বলতে কী বোঝায় এ ব্যাপারে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অর্থের যোগানের পরিমাণ পরিমাপ চারটি সংকেত M_1, M_2, M_3, M_4 এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

M_1 আধুনিক অর্থনীতিতে তিন ধরনের অর্থ দেখা যায়। ধাতব মুদ্রা, কাগজী মুদ্রা ও আমানত, অর্থ জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক সঞ্চয় সংগ্রহ করে থাকে আমানত গ্রহণের মাধ্যমে। ব্যাঙ্কের কাছে যে অমানত থাকে সেই আমানতগুলিকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ কার হয়— ১) চলতি আমানত, ২) মেয়াদী আমানত বা স্থায়ী আমানত এবং ৩) সঞ্চয় আমানত।

চলতি আমানতের অর্থ আমানতকারী যেহেতু তার ইচ্ছামতো যে কোনো সময়ে যে কোনো পরিমাণ চেকের মাধ্যমে তুলতে পারে সেহেতু চলতি আমানতের অর্থ নগদ অর্থের (ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা) মতোই কাজ করে বলে চলতি আমানতে যে পরিমাণ অর্থ জমা থাকে সেটি অর্থের যোগানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সমস্ত অর্থনীতিবিদ একমত।

জনসাধারণ যেমন সাধারণ ব্যাঙ্কে আমানত রাখে ঠিক একইভাবে দেশের সরকার ও অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) কাছে অর্থ জমা রাখেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখা আমানতের সমস্ত অংশই ইচ্ছামতো তোলা যায় না। যে অংশ তোলা যায় না তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 'মজুত অর্থ'। অপরপক্ষে এই অমানতের যে অংশটি ইচ্ছামতো তোলা যায় তাকে বলা হয় ''কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অন্যান্য আমানত''। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অন্যান্য আমানতের পরিমাণও অর্থের যোগানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

জনসাধারণের কাছে কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণ (C), ব্যাঙ্কগুলির হাতে চলতি আমানত বা চাহিদা আমানত (DD) এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অন্যান্য আমানত (OD) -এর যোগফলকে M_1 বলা হয়। অর্থাৎ

M_1 = জনসাধারণের কাছে কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণ

+ ব্যাঙ্কগুলির হাতে চলতি আমানত বা চাহিদা আমানত

+ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অন্যান্য আমানত

অর্থাৎ M = C + DD + OD

অনেক অর্থনীতিবিদের মতে এই M_1 -ই হল দেশের অর্থের যোগান। এই M_1 কেই বলা হয় সংকীর্ণ অর্থ।

M_2 সাধারণ ব্যাঙ্ক চলতি আমানত ছাড়া মেয়াদী আমানত বা স্থায়ী আমানত ও সঞ্চয় আমানত থাকে। আবার ব্যাঙ্ক ছাড়া ডাকঘরে সঞ্চয় ব্যাঙ্কে আমানত থাকে। এই সমস্ত আমানত অর্থের যোগানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

এই ব্যাপারে বাস্তবে যা করা হয় সেটি হল সঞ্চয় আমানতের যে অংশ ইচ্ছামতো চেকের মাধ্যমে তোলা যায় সেটি চলতি আমানতের পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে ফলে সঞ্চয় আমানতের এই অংশ M_1-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ডাকঘরে সঞ্চয় ব্যাঙ্কের আমানতকে -এর সঙ্গে যোগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় M_2।

অর্থাৎ M_2 = M_1+ ডাকঘরে সঞ্চয় ব্যাঙ্কের আমানত (P.O.S.B.D)

জনসাধারণের কাছে কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণ (C) + ব্যাঙ্কগুলির হাতে চলতি আমানত বা চাহিদা আমানত (DD)+ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অন্যান্য আমানত (OD)+ ডাকঘরের সঞ্চয় ব্যাঙ্কের আমানত (P.O.S.B.D)।

অর্থাৎ M_2 = M_1 + P.O.S.B.D = C + DD + OD + P.O.S.B.D.

M_3 সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির মেয়াদী আমানত বা স্থায়ী আমানতকে M_1 -এর সঙ্গে যোগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে M_3 বলা হয়। এই M_3 কে বলা হয় প্রশস্ত অর্থ।

অর্থাৎ M_3 = M_1 + ব্যাঙ্কের মেয়াদী আমানত (TD) = জনসাধারণের কাছে কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণ (C) + ব্যাঙ্কগুলির হাতে চলতি আমানত বা চাহিদা আমানত (DD) + কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অন্যান্য আমানত (OD)+ ব্যাঙ্কের মেয়াদী অমানত (TD)।

অর্থাৎ M_3 = M_1 + TD

= C + DD + (OD + TD)

M_4 ডাকঘরে সঞ্চয় ব্যাঙ্কের আমানত ও সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির মেয়াদী আমানতকে M_1 এর সঙ্গে যোগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে বলা হয়। অর্থাৎ

M_4 = M_1 + ডাকঘরে সঞ্চয় ব্যাঙ্কের আমানত (P.O.S.B.D.) + ব্যাঙ্কের মেয়াদী আমানত (TD)

= জনসাধারণের কাছে কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণ (C) + ব্যাঙ্কগুলির হাতে চলতি আমানত বা

চাহিদা আমানত (DD) + কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অন্যান্য আমানত (OD) + ডাকঘরে সঞ্চয় ব্যাঙ্কের আমানত (P.O.S.B.D) + ব্যাঙ্কের মেয়াদী আমানত (TD)।

অর্থাৎ $M_4 = M_1 + P.O.S.B.D. + TD$

$= C + DD + OD + P.O.S.B.D. + TD$

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অর্থের পরিমাণ বলতে কি বোঝায় এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও M_1 কেই সাধারণভাবে অর্থের যোগানের পরিমাণ হিসাবে ধরা হয়।

2.6 অর্থের উপাদান

যেহেতু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের অর্থ দেখা যায়, সেহেতু নানাভাবে অর্থের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এখন আমরা এই বিভিন্ন ধরনের উপাদান নিয়ে এক এক করে আলোচনা করব।

A. **প্রচলনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ** : প্রচলনের ভিত্তিতে অর্থকে প্রকৃত অর্থ (actual money) ও হিসেব-নিকেশের অর্থ (accounting money), এই দুভাগে ভাগ করা হয়। প্রকৃত অর্থ বলতে সেই অর্থকে বোঝায় যেটি কাল্পনিক নয় - অর্থাৎ যেটার বাস্তব জগতে অস্তিত্ব রয়েছে এবং যেটি জনসাধারণের মধ্যে হাত পাল্টায়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধাতু মুদ্রা বা কাগজী নোট প্রচলিত আছে তাদের ও প্রকৃত অর্থ বলে। অপরদিকে যে অর্থ ধরা-ছোঁওয়া যায় না বা বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই (অর্থাৎ চোখে যাকে দেখা যায় না) কিন্তু যার মাধ্যমে হিসেব-নিকেশ রাখা হয়, তাকে হিসেব-নিকেশের অর্থ বলে। কোন দেশের প্রকৃত অর্থ ও হিসাব-নিকেশের অর্থ এক ও অভিন্ন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। যদি এ দুটি আলাদা হয়, তাহলে এদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিনিময়ের হার থাকে যার ভিত্তিতে হিসেব-নিকেশের অর্থকে প্রকৃত অর্থে রূপান্তরিত করা যায়। হিসেব-নিকেশের অর্থ যেহেতু লেনদেনের কাজে ব্যবহৃত হয় না, সেহেতু এটি হাত পাল্টায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (International Monetary Fund) সমস্ত হিসেবপত্র যে মুদ্রায় করা হয় তাকে Special Drawing Rights (বা সংক্ষেপে SDR) বলে। এটির কোনও অস্তিত্ব বাস্তবে দেখা যায় না। কেবলমাত্র IMF-এর হিসেবের খাতাতেই (অর্থাৎ কাগজে-কলমেই) এর অস্তিত্ব রয়েছে।

B. **উপকরণ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ :** যে উপকরণ বা বস্তু দিয়ে অর্থ তৈরি করা হয় তার ভিত্তিতে অর্থকে ধাতব অর্থ এবং কাগজী অর্থ-এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ধাতব অর্থ বিভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরি হয়। অপরদিকে, কাগজী নোটকে কাগজী মুদ্রা বলা হয়। ছোট-খাটো বা খুচরো লেনদেনের- যেমন একটা সিগারেট বা দেশলাই কেনা বা ট্রামে-বাসের ভাড়া দেওয়ার জন্য ধাতব মুদ্রার প্রয়োজন পড়ে। যেমন, অনেক বাসের মধ্যেই লেখা থাকে -১০ টাকা বা ২০ টাকার নোট দিলে ভাঙানি পাওয়া যাবে না। ট্রেনের টিকিট ঘরে অনেক সময় লেখা থাকে - সঠিক ভাড়া দিয়ে টিকিট কাটুন। এর কারণ হল ছোট ধাতব মুদ্রার অভাব - অর্থাৎ প্রয়োজনের (চাহিদার) তুলনায় এদের যোগান অনেক কম। অবশ্য বড় বড় লেনদেনের ক্ষেত্রে ধাতব মুদ্রা ব্যবহার করা অসম্ভব না হলেও অসুবিধাজনক। এর মূল কারণ হল এই যে, ধাতব মুদ্রা এক স্থান থেকে অপর স্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন। তাই বড় ধরনের লেনদেনের

ক্ষেত্রে উচ্চমূল্যের কাগজী নোটই ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বহুল পরিমাণ টাকা এক স্থান থেকে অতি সহজে অপর স্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের দেশে ২, ৫, ১০, ২০, ২৫, ৫০ পয়সার এবং ১ টাকা, ২ টাকা এবং ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা বাজারে চালু আছে (যদিও ২৫ এবং ১০ পয়সার মুদ্রাগুলো কখনই দেখতে পাওয়া যায় না)। এছাড়া ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার কাগজী নোট দেখতে পাওয়া যায়।

C. গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ : গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে অর্থকে আইনসিদ্ধ অর্থ (legal tender money বা fiat money) এবং ঐচ্ছিক অর্থ (optional money) বলে। অর্থের পেছনে আইনের সমর্থন থাকলে তাকে আইনসিদ্ধ অর্থ বলে। যেহেতু দেশের সরকার আইন পাশ করে এই অর্থকে প্রচলন করেন, সেহেতু এই ধরনের অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে সকলে রাজি বা বাধ্য থাকেন। আমাদের দেশে সমস্ত ধাতব মুদ্রা ও কাগজী নোট হল আইনসিদ্ধ' অর্থ এবং এগুলি সবই সরকারী গ্যারান্টিযুক্ত। অপরদিকে, ঐচ্ছিক অর্থের পেছনে এই ধরনের গ্যারান্টি থাকে না। তাই সকলেই এই অর্থ সকল প্রকার লেনদেনের জন্য গ্রহণ করতে আইনগতভাবে বাধ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমানত অর্থ গ্রহণ করতে বা চেকের মাধ্যমে পাওনা নিতে কোন ব্যক্তি রাজি নাও হতে পারে। এই কারণে একে ঐচ্ছিক অর্থ বলে। অর্থাৎ এটি আইনসিদ্ধ অর্থ নয়। দু'ধরনের আইনসিদ্ধ অর্থ : আইনসিদ্ধ অর্থ আবার দুরকম হয়; অসীম আইনসিদ্ধ (unlimited legal tender money) এবং সসীম (সীমিত) আইনসিদ্ধ অর্থ (limited legal tender money)। অসীম আইনসিদ্ধ অর্থের সাহায্যে যে-কোন মূল্যের লেনদেন মেটানো যায়। অপরদিকে সসীম আইনসিদ্ধ অর্থের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে পাওনা মেটানোর প্রস্তাব করা হলে কোন ব্যক্তি নিতে রাজি নাও হতে পারেন। ধরা যাক, রাম সেনের কাছে বিবেক জালান ২ লাখ টাকা পাবেন। রামবাবু যদি ৫০ পয়সার ধাতব মুদ্রার সাহায্যে এই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে চান তাহলে বিবেকবাবু তা নিতে অসম্মত হতে পারেন। কারণ, আমাদের দেশে এক টাকার নোট ছাড়া অন্য কাগজী নোটগুলি অসীম আইনসিদ্ধ অর্থ কিন্তু ধাতব মুদ্রাগুলি সসীম আইনসিদ্ধ অর্থ।

D. পদমর্যাদার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ : পদমর্যাদার বা নিদর্শনের ভিত্তিতে অর্থকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায-প্রামাণিক অর্থ (standard money) এবং টোকেন অর্থ (token money)। প্রামাণিক অর্থ হল সেই অর্থ যার বাজার (দ্রব্য হিসেবে) মূল্য বা অন্তর্নিহিত মূল্য (intrinsic value) অর্থ হিসেবে এর মূল্যের (যাকে ইংরাজিতে face value বলে) সমান। একটি ধাতব মুদ্রা বা কাগজী নোটের ওপর যে মূল্যটি লেখা থাকে তাকেই প্রদর্শন মূল্য (face value) বলে। অন্য ভাষায় বললে, যদি কোন অর্থের দ্রব্য হিসেবে মূল্য এবং অর্থ হিসেবে মূল্য পরস্পরের সমান হয়, তবে তাকে প্রামাণিক অর্থ বলে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ধাতব মুদ্রার কথা বলা যায়। এটির দ্রব্য হিসেবে যে বাজার মূল্য তা যদি এটির অর্থ হিসেবে মূল্যের সমান হয়, তাহলে এটিকে প্রামাণিক অর্থ বলা হবে। যদি এটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত না হয়, তাহলেও ধাতু হিসেবে বাজারে এর একটা মূল্য থাকবে। কারণ, সরকার যদি এটিকে অর্থ হিসেবে বাতিলও করে দেন, তাহলে এটি গলিয়ে অন্য কাজে লাগানো যাবে-যেমন বাসন তৈরি করা বা খেলনা তৈরি করা। ধাতু হিসেবে এর যা বাজার মূল্য তাকেই অন্তর্নিহিত মূল্য বলে। ০.৬ নং চিত্রে অর্থের এই বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ দেখানো হয়েছে।

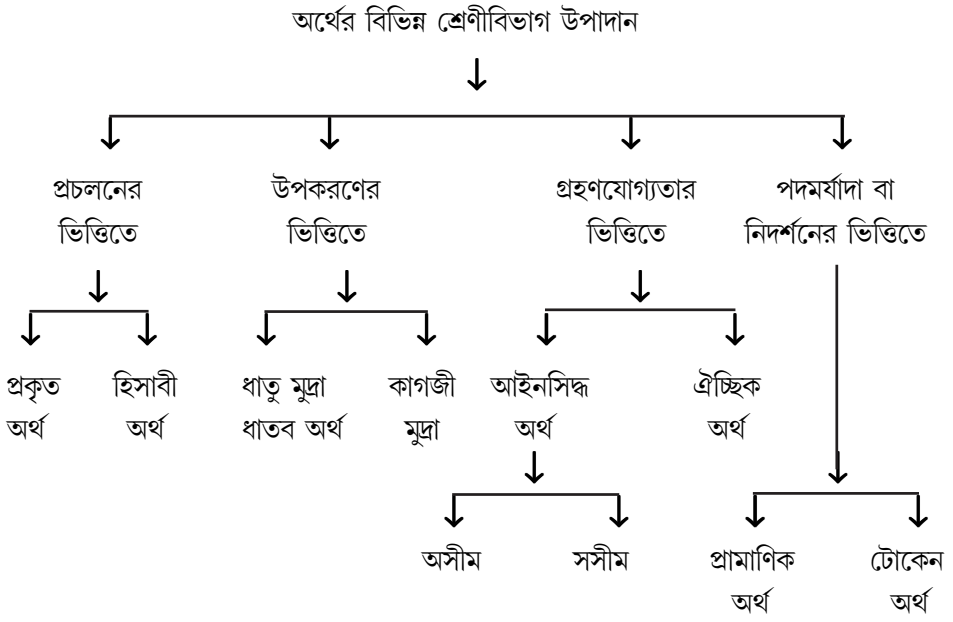

চিত্র ০.৬ : বিভিন্ন প্রকারের অর্থ

আজকের দিনে পৃথিবীর কোন দেশেই প্রামাণিক অর্থ দেখতে পাওয়া যায় না। যেসব ধাতু কার কোন টোকেন অর্থ বলে। যেমন ৫০০ টাকার নোটের অর্থ হিসেবে মূল্য ৫০০ টাকাই, কিন্তু যদি কখনও সরকার কোন কারণে (যেমন কালো টাকা সাদা টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য) বাতিল করেন বা যদি এটি লোকে ভয়ে অর্থ হিসেবে নিতে না চায় (টাকা জাল হলে এরকম হয়) তাহলে এর কোন দাম নেই। যেহেতু ৫০০ টাকা নোটের অন্তর্নিহিত (দ্রব্য) মূল্য এর অর্থ হিসেবে মূল্য অপেক্ষা কম, সেহেতু এটি একটি টোকেন অর্থ। আবার এক টাকার ধাতব মুদ্রার দ্রব্য (বাজার) মূল্য এক টাকার চেয়ে কম বলে এটিও একটি টোকেন অর্থ।

মনে রাখতে হবে যে, কোন অর্থের দ্রব্য মূল্য তার অর্থ হিসেবে মূল্যের সমান বা কম হতে পারে কিন্তু কখনই বেশি হতে পারে না। কারণ তাহলে লোকে মুদ্রাটি গলিয়ে ধাতু হিসেবে বিক্রি করে লাভ করতে পারবে।

টোকেন অর্থ ব্যবহারের তিনটি কারণ : তিনটি কারণে পৃথিবীর সব দেশে টোকেন অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

(i) **মুদ্রা গলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা :** ধাতুর দাম বেড়ে গেলে, প্রামাণিক অর্থের অন্তর্নিহিত মূল্য এর অর্থ হিসেবে মূল্যের চেয়ে বেশি হয়। ফলে লোকে এই অর্থ গলিয়ে ফেলে ধাতু হিসেবে বাজারে বিক্রি করে লাভ করে। কিন্তু টোকেন অর্থের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব নয়।

(ii) **ধাতুর স্বল্পতা :** ধাতুর অপ্রাচুর্যতার জন্য অনেক সময় প্রামাণিক অর্থ প্রয়োজনমত বাজারে প্রচলন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু টোকেন অর্থ যত খুশি বাজারে ছাড়া যায়।

(iii) **যোগান বৃদ্ধি :** প্রামাণিক অর্থের যোগান প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। অপরদিকে টোকেন অর্থের যোগান হঠাৎ প্রয়োজন হলে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ানো যায়।

2.7 উচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত অর্থ : ধারণা ও গুরুত্ব

সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রচলিত মুদ্রার (কাগজী ও ধাতব) পরিমাণই হল উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থ (H) প্রচলিত মুদ্রার একটি অংশ (Cp) জনসাধারণের কাছে থাকে এবং একটি অংশ ব্যাঙ্কগুলির কাছে আমানত হিসাবে থাকে। ব্যাঙ্কগুলির কাছে আমানত হিসাবে গচ্ছিত অর্থের একটি অংশ তারা নিজেদের কাছে গচ্ছিত রাখে এবং আমানতের আর একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখে। সুতরাং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থের পরিমাণ হল (H) জনসাধারণের কাছে থাকা প্রচলিত অর্থের পরিমাণ (Cp) এবং ব্যাঙ্কগুলির কাছে আমানত হিসাবে থাকা প্রচলিত অর্থের পরিমাণ (R) অতএব $H = Cp + R$

সুতরাং সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থ সৃষ্টি করে থাকে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থ সৃষ্টিতে কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে চাহিদা আমানত সৃষ্টি করে সেটি প্রচলিত অর্থের ন্যায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থের চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে অর্থের যোগান নির্ধারণের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত বলে অনেক অর্থনীতিবিদ এই তত্ত্বকে অর্থ যোগানের H তত্ত্ব (The H Theory of Money Supply) বলে থাকেন। কিন্তু এই তত্ত্বটি অর্থ যোগানের অর্থের গুণক তত্ত্ব (Money Multiplier Theory of Money Supply) নামেই বেশি পরিচিত। কারণ এই তত্ত্বে অর্থের যোগানের পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে উচ্চক্ষমতা প্রাপ্ত অর্থকে কিছু দিয়ে গুণ করার পর।

চিত্রের সাহায্যে মোট অর্থ যোগানের সাথে উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা হল।

মোট অর্থ যোগানের পরিমাণ (M)

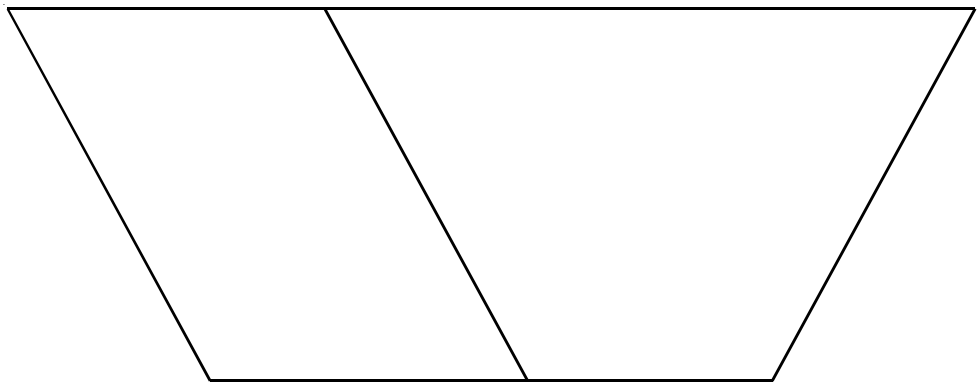

চিত্রের নীচের অংশে উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থ যোগানের পরিমাণ উপরের অংশে মোট অর্থ যোগানের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে মোট অর্থ যোগানের পরিমাণ (অর্থাৎ উপরের অংশে) নির্ধারিত হয়েছে উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থ যোগানের পরিমাণকে (অর্থাৎ নীচের অংশ) কিছু দিয়ে গুণ করে। চিত্র থেকে আরো দেখা

যাচ্ছে উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থ যোগানের যে পরিমাণ অর্থ জনসাধারণের কাছে থাকে (Cp) ঠিক সেই পরিমাণ অর্থই মোট অর্থ যোগানের পরিমাণের মধ্যে থাকছে। সুতরাং মোট অর্থ যোগানের পরিমাণের সঙ্গে জনসাধারণের কাছে থাকা প্রচলিত অর্থের পরিমাণের একক সম্পর্ক (One to one) বর্তমান। কিন্তু মোট অর্থ যোগানের পরিমাণের চাহিদা আমানতের অংশ (DD) হল ব্যাঙ্কের আমানত অর্থের (R) কিছু গুণ। এর অর্থ হল যদি এক একক উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থ ব্যাঙ্কের আমানত রাখা হয় তাহলে সেটি এক এককের বেশি পরিমাণ অর্থ চাহিদা আমানত হিসাবে সৃষ্টি হয়ে মোট অর্থ যোগানের পরিমাণ এক একক অপেক্ষা বেশি হয়ে থাকে।

সুতরাং মোট অর্থ যোগানের সাথে উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে থাকে অর্থের গুণকের দ্বারা। মোট অর্থ যোগানের পরিমাণকে (M) উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থের পরমাণ (H) দিয়ে ভাগ করলে অর্থের গুণক (m) পাওয়া যায়। অর্থাৎ

$$m = \frac{M}{H}$$

অতএব আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে জনসাধারণের কাছে থাকা প্রচলিত অর্থের পরিমাণ (Cp) যদি বাড়ে এবং নগদ আমানতের পরিমাণ (R) যদি স্থির থাকে তাহলে সরাসরিভাবে অর্থনীতির মোট অর্থ যোগানের পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু এর পরিবর্তে যদি ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে থাকা প্রচলিত অর্থের পরিমাণ বাড়ে তাহলে কিন্তু সরাসরি মোট অর্থ যোগানের পরিমাণে পরিবর্তন না ঘটিয়ে অর্থের গুণকের মাধ্যমে মোট অর্থ যোগানের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। জনসাধারণের কাছে থাকা অর্থ যেটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছে জমা থাকে সেটির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক জনসাধারণকে দেওয়া ঋণের পরিমাণ বাড়াতে পারে, কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থ যোগানের পরিমাণ এবং বণ্টনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। দেশে উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থ যোগানের পরিমাণ কেবলমাত্র ঐ দেশের সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে।

2.8 অর্থের গুণক

অর্থের গুণক হল একটি মাত্রা (Degree), যার মাধ্যমে অর্থের যোগানের সম্প্রসারণ ঘটে থাকে উচ্চক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য। মোট অর্থ যোগানের পরিমাণকে (M) উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থ যোগানের পরিমাণ (H) দিয়ে ভাগ করলে অর্থের গুণক (m) পাওয়া যায়। অর্থাৎ

$$m = \frac{M}{H}$$

বা $M = m. H.$

সুতরাং মোট অর্থ যোগানের পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে অর্থ গুণকের মানের (m) উপর এবং উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থ যোগানের পরিমাণের উপর। এখানে অর্থের গুণকের মান নির্ধারণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

অর্থনীতিতে মোট অর্থ যোগানের পরিমাণ (M) হল জনসাধারণের কাছে থাকা প্রচলিত অর্থের পরিমাণ (Cp) এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছে থাকা জনসাধারণের চাহিদা আমানতের (DD) পরিমাণ। অর্থাৎ

M = Cp + DD ..... (1)

জনসাধারণের কাছে থাকা প্রচলিত অর্থের পরিমাণ (Cp) হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছে থাকা চাহিদা আমানতের (DD) একটি অংশ। ধরা হচ্ছে জনসাধারণের কাছে থাকা এই প্রচলিত অর্থের অনুপাত হল K। অতএব

Cp = K·DD.

সুতরাং M = K·DD + DD (1 নং সমীকরণে Cp = K·DD. বসিয়ে)

বা M = (K + 1) DD..... (2)

আবার উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ (H) হল জনসাধারণের কাছে থাকা প্রচলিত অর্থের পরিমাণ (Cp) এবং ব্যাঙ্কগুলির কাছে নগদ আমানত হিসাবে থাকা প্রচলিত অর্থের পরিমাণ (R) যেটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চাহিদা আমানতের একটি অনুপাত, যাকে বলা যায় নগদ জমার অনুপাত (r)

অর্থাৎ H = Cp + R .....(3)

সুতরাং R = r·DD

অতএব H = K·DD + r·DD (3 নং সমীকরণে Cp = K·DD এবং R = r·DD বসিয়ে)

বা H = (K + r) DD.....(4)

আবার অর্থের গুণক (m) হল

$$m = \frac{M}{H}$$

অর্থাৎ $m = \frac{M}{H} = \frac{(K+1)D \cdot D}{(K+r)DD}$ (সমীকরণ (2) এবং (4) এর মান বসিয়ে)

অর্থাৎ অর্থের গুণক $m = \frac{M}{H} = \frac{K+1}{K+r} = \frac{1+K}{r+K}$ .....(5)

বা $\frac{M}{H} = \frac{1+K}{r+K}$

বা $\frac{M}{H} = \frac{1+K}{r+K}$ H..... (6)

(5) নং সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে অর্থ গুণকের মান $\left(\frac{1+K}{r+K}\right)$, নগদ জমার অনুপাত (r) এবং জনসাধারণের কাছে থাকা প্রচলিত অর্থের অনুপাত (K)-এর মানের উপর নির্ভরশীল। অর্থ গুণকের মান

বাড়বে যদি নগদ জমার অনুপাত (r) কমে। জনসাধারণের হাতে থাকা প্রচলিত অর্থের অনুপাত (K) কমলেও অর্থ গুণকের মান বাড়বে। তার কারণ অর্থ গুণকের লব এবং হর উভয়ক্ষেত্রেই K বর্তমান। কিন্তু লবে K যোগ হচ্ছে এক (1)-এর সাথে কিন্তু হরে যোগ হচ্ছে ভগ্নাংশের সাথে। এর অর্থ হল জ্যামিতিকভাবে K-এর মান কমলে লব-এর মান হরের অপেক্ষা বেশি হারে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ K-এর মান কমলে গুণকের মান বাড়বে।

সুতরাং 6 নং সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে মোট অর্থ যোগানের পরিমাণ নির্ভর করে উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থ মানের পরিমাণের (H) উপর এবং অর্থের গুণকের মান $\left(\frac{1+K}{r+K}\right)$-এর উপর। অর্থাৎ মোট অর্থ যোগানের পরিমাণ বাড়বে যদি (H) এর মান বাড়ে এবং r ও K-এর মান কমে।

কিন্তু অর্থের যোগান নির্ধারণ সংক্রান্ত এই তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সীমাবদ্ধতাগুলি হল :

১. এই তত্ত্বে M এবং H-এর মধ্যে যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে সেটি অকারণে সমার্থবাচক শব্দসমূহের একই বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ। কারণ সম্পর্কটি কয়েকটি সংজ্ঞা থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এর কোনো আচরণগত সম্পর্ক বর্তমান নেই।

২. এই তত্ত্বে K এবং r-এর মান স্থির এবং নির্দিষ্ট হিসাবে ধরা হয়েছে এবং তাদের ব্যবহার করা হয়েছে সম্পর্কের ন্যায়। কিন্তু এটি বাস্তব সম্মত নয়।

৩. এই তত্ত্বে চাহিদা আমানত ও মেয়াদী আমানতের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি, এটিও একটি অবাস্তব অনুমান।

2.9 অনুশীলনী

1. অর্থের কার্যাবলী আলোচনা করুন।
2. অর্থের জোগানের বিকল্প পরিমাপ ও তাদের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।
3. উচ্চক্ষমতা প্রাপ্ত অর্থের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
4. অর্থের গুণক এর ধারণা বর্ণনা করুন।
5. অর্থের উপাদান গুলি উল্লেখ করুন।

একক-3 ◆ অর্থ ও ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বাজার

গঠন

3.1 উদ্দেশ্য

3.2 প্রস্তাবনা

3.3 বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

3.4 বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী

3.5 বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের গুরুত্ব

3.6 ভারতীয় বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কাঠামো

3.7 বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া

3.8 অনুশীলনী

3.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে —

- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ধারনা
- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী
- ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কাঠামো
- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কিভাবে ঋণ সৃষ্টি করে।

3.2 প্রস্তাবনা

কোন দেশের অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অবদান অপরিসীম। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সাধারন জনগনের সঞ্চয়কে সুরক্ষিত রাখে ও সাথে সাথে শিল্প বাণিজ্যর কাজে যোগান দিয়ে থাকে। শক্তিশালী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দেশের বাণিজ্যকে তরান্বিত করে ও উদোক্তাদের উৎসাহিত করে। সুষ্ঠ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণ সৃষ্টি করে ঋনের চাহিদা মেটানো ও সম্ভব হয়।

3.3 বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

সাধারণত ব্যাঙ্ক বলতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককেই বোঝানো হয়। প্রতিটি দেশেই আমানত সংগ্রহ ও ব্যবসা বাণিজ্যে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহন করে এবং ঐ আমানত চাহিদামাত্র চেক, ড্রাফট বা

অন্য উপায়ে ফেরৎ দিতে পারে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বলে।

3.4 বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী

যে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের জন্য জনসাধারণকে কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং ঐ আমানত আমানতকারী চাহিবামাত্র চেক, ড্রাফট বা অন্য উপায়ে ফেরৎ দিতে পারে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নানাধরনের কাজ করে থাকে। এখানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উল্লেখযোগ্য কাজগুলি আলোচনা করা হল :

১. **সঞ্চয় সংগ্রহ বা আমানত গ্রহণ :** সঞ্চয় সংগ্রহ করা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ করে থাকে আমানত গ্রহণের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সঞ্চিত অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে জমা রাখে। এই জমাকেই আমানত বলা হয়। আমানত তিন প্রকারের হতে পারে : চলতি আমানত, মেয়াদী আমানত বা স্থায়ী আমানত এবং সঞ্চয় আমানত। যে আমানত অর্থ আমানতকারী তার ইচ্ছামতো যে কোনো সময়ে, যে কোনো পরিমাণে চেকের মাধ্যমে তুলতে পারে তাকে চলতি আমানত বলে। আবার যে আমানত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়ে থাকে এবং ঐ নির্দিষ্ট সময়ের আগে ইচ্ছামতো সাধারণত তোলা যায় না সেই আমানতকে মেয়াদী আমানত বা স্থায়ী আমানত বলে। আবার যে আমানত আমানতকারী যে কোনো সময়ে, যে কোনো পরিমাণে তুলতে পারে না এবং অর্থ তোলার ব্যাপারে কিছু বাধা নিষেধ থাকে সেই আমানতকে সঞ্চয় আমানত বলে।

২. **ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ :** আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অন্যতম কাজ হল বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নানাভাবে এই কাজ করে থাকে। প্রথমত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করতে পারে। তৃতীয়ত ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে তার জমার চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ তোলার সুবিধা দিতে পারে। তৃতীয়ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হুণ্ডি বাট্টা করতে পারে। যখন কোনো প্রতিষ্ঠান ধারে দ্রব্য বিক্রি করে তখন হুণ্ডি সৃষ্টি হয়। এই হুণ্ডিগুলি তিন মাসের পর অর্থে রূপান্তরিত হয়। অর্থের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছে হুণ্ডি জমা রেখে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। চতুর্থত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ডিবেঞ্চার অথবা সরকারি ঋণপত্র কিনে সরাসরি অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

৩. **ঋণ সৃষ্টি বা আমানত সৃষ্টি :** বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঋণ বা আমানত সৃষ্টি। ঋণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এই আমানত সৃষ্টি করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যখন কোনো ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেয় তখন তাকে নগদ অর্থ না দিয়ে তার নামে একটি হিসাব খুলে ঐ হিসাবে ঋণের অর্থ জমা দেয়। এই ঋণ অর্থের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নতুন আমানত সৃষ্টি করে। এই আমানত আবার নতুন করে ঋণ সৃষ্টি করে এবং তার ফলে নতুন আমানত সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টি করে।

৪. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাহায্য :** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন দ্রব্য চালানের রসিদ ও বিদেশী হুণ্ডি বহন ইত্যাদি কাজও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক করে থাকে। অনেক সময়

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আমদানিকারীদের গ্যারান্টার হিসাবে কাজ করে।

৫. **গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ :** বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তার আমানতকারী বা গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নানাভাবে এই কাজ করে থাকে। প্রথমত, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে তার গ্রাহকদের অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানোর কাজ করে থাকে। দ্বিতীয়ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের নির্দেশমতো অন্য ব্যাঙ্ক থেকে গ্রাহকের পাওনা অর্থ আদায় করে থাকে। তৃতীয়ত গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসাবে কোম্পানীর শেয়ার ও অন্যান্য লগ্নিপত্র কেনাবেচা কাজ করে থাকে। চতুর্থত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকদের শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারের যথাক্রমে লভ্যাংশ ও সুদ আদায় করে গ্রাহকের তহবিলে জমা করে। পঞ্চমত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের অছি বা ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করে থাকে। যেমন কোনো ব্যক্তি তার সম্পত্তি উইল করে উইল ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে পারে। তার মৃত্যুর পর সেই উইল অনুযায়ী সম্পত্তির বণ্টন যাতে হয় তার দায়িত্ব ব্যাঙ্কের উপর থাকতে পারে। ষষ্ঠত যখন কোনো কোম্পানীর বন্ড বিক্রি হয় তখন সেই বন্ডগুলির গ্যারান্টার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হয়ে থাকে।

৬. **সরকারের কাজ :** বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দেশের সরকারের নির্দেশমতো বহু সরকারি কাজ করে থাকে, যেমন বেকারদের বেকারভাতা দেওয়া, শিক্ষকদের বেতন দেওয়া ইত্যাদি। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাওনা অর্থ আদায় করে সেই প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা দেয়। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সরকারের আর্থিক নীতিকে (যেমন গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রসার) বাস্তবে রূপদান করে।

৭. **অন্যান্য কাজ :** উপরের আলোচনা করা হয়েছে এমন কাজ ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আরও কিছু কাজ করে থাকে যেমন

ক. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যক্তি ও পরিবারের মূল্যবান সম্পত্তি লকারের মাধ্যমে নিরাপত্তার সঙ্গে রক্ষা করে।

খ. গ্রাহকদের সুবিধার জন্য উপহার চেক, ভ্রাম্যমান চেক ইত্যাদি সরবরাহ করে।

গ. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কিছু কিছু অচিরাচরিত কাজও বর্তমানে করছে যেমন— মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড প্রকল্প, ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে ঋণদান, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড চালু ইত্যাদি।

৮. **অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা বা উন্নয়নমূলক কাজ :** আধুনিক কালের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অনেক উন্নয়নমূলক কাজও করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের পরিকল্পনায় নির্ধারিত অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে থাকে। অনগ্রসর বা গ্রামীণ এলাকায় শাখা স্থাপন করে সেই এলাকায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়ে থাকে।

3.5 বানিজ্যিক ব্যাঙ্কের গুরুত্ব

বাণিজ্য জগতে নানা ধরনের লেনদেন সংঘটিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা ও গুরুত্ব এক্ষেত্রে অপরিসীম। ব্যাবসা ও বাণিজ্যের পরিধি যেমন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের গুরুত্ব ততোধিক বৃদ্ধি হচ্ছে। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাফল্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রসার ও অগ্রগতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের গুরুত্ব ও ভূমিকা হল :

১. আমানত গ্রহণ (Acceptance of Deposit) : বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দেশের জনগণের বা অন্যান্য সংস্থার সঞ্চিত অর্থ নিরাপদ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিকে গচ্ছিত রাখে। ব্যাঙ্কের এই গচ্ছিত অর্থই হল আমানত। ব্যাঙ্ক ওই আমানতের উপর সুদপ্রদান করে। আবার আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক থেকে গচ্ছিত অর্থ যখন ইচ্ছা তুলতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে সাধারণত চার প্রকার আমানত ব্যবস্থা প্রচলিত , (i) চলতি আমানত, (ii) সঞ্চয়ী আমানত, (iii) মেয়াদি আমানত এবং (iv) পৌনঃপুনিক আমানত।

২. ঋণপ্রদান (Granting Loan) : কারবারি জগতে ঋণের প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণপ্রদান করে অর্থের জোগান দেয়। ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট থেকে আমানত বাবদ যে অর্থ জমা নেয় তা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও কারবারি প্রতিষ্ঠানকে ঋণপ্রদান করে। ঋণপ্রদানের সময় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি ঋণের গ্যারান্টি হিসাবে বন্ধক রাখে। এভাবে ব্যাবসায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থান হয়।

৩. সঞ্চয় প্রেরণা (avings Motivation) : জনসাধারণ তার আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করে। সেই সঞ্চয় যথাযোগ্য জায়গায় না-রাখলে তার থেকে যেমন প্রতিদান প্রত্যাশা করা যায় না একই সঙ্গে মূল অর্থ ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা কম থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে তাদের সঞ্চয় রেখে নিশ্চিন্ত হয় এবং প্রতিদান পায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক পরোক্ষভাবে সঞ্চয়ে প্রেরণা তথা উৎসাহ দেয়।

৪. শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি (Development of Industry-Trade) : বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণপ্রদান করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণেরও ব্যবস্থা করে। শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সমস্যার সমাধান করে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটায়।

৫. বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা (Assistance in Foreign Trade) : বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে লেনদেনের পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার আদানপ্রদানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি হিসাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সহায়তা (Assistance in Small Business) : ভারতবর্ষের মতো দেশে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব অতুলনীয়। এই শিল্পে উদ্যোক্তারা ও ব্যবসায়ীরা তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্বল্প সুদে এদের অর্থ সাহায্য করে। বর্তমানে বেশিরভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে (Small and Medium Enterprises) ঋণের জন্য SME বিভাগ রয়েছে। বর্তমানে সরকারও এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

৭. কারবারিদের আর্থিক লেনদেনে সহায়তা (Assistance in Financial Transactions of Businessmen) ঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কারবারিদের হুন্ডি ভাঙানোর (Discounting of Bills) ব্যবস্থা করে। ফলে কারবারিদের আর্থিক সমস্যা অনেকাংশে সমাধান হয়। এর বিনিময়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বাট্টা পেয়ে থাকে। তা ছাড়া পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ঋণের প্রত্যয়নপত্র, চালান, বিমাপত্র প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. কর্মসংস্থান (Employment Generation) : ব্যাঙ্কিং হল আর্থিক পরিসেবা ক্ষেত্র। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের গুরুত্ব এক্ষেত্রে প্রসংশনীয়।

৯. আমানতকারীদের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষণ (Preservation of Precious Items of Depositors) ঃ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তার আমানতকারীদের মূল্যবান সামগ্রী যেমন সোনারুপোর অলংকার, মূল্যবান দলিলপত্র, কোম্পানির শেয়ারপত্র বা ঋণপত্র গচ্ছিত রাখার দায়িত্বগ্রহণ করে এবং সেগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

১০. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ (Control of Inflation) ঃ দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও তপশিলভুক্ত ব্যাঙ্ক গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার ব্যবস্থা করে।

3.6 ভারতীয় বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কাঠামো

স্বাধীনতার সময় ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। বিভিন্ন ধরনের পরিচালনার অধীনে ৬৪৮টি ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তাদের কার্যধারা পরিচালনা করত। ১৯৪৯ সালে ভারতে সর্বপ্রথম ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কার শুরু হয়। এই বছরেই ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ ঘটে।

১৯৫৫ সালের ১ জুলাই ভারতের সর্বপ্রধান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ও ভারতের কতিপয় ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যের ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ দ্বারা স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এর ফলে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জগতে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। ১৯৬৯ সালে সর্ববৃহৎ ১৪টি দেশী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও পরে আরো ৬টি ব্যাঙ্ক রাষ্টায়ত্ত করে ব্যাঙ্কজগতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রটি বর্তমানে সম্প্রসারিত হয়েছে।

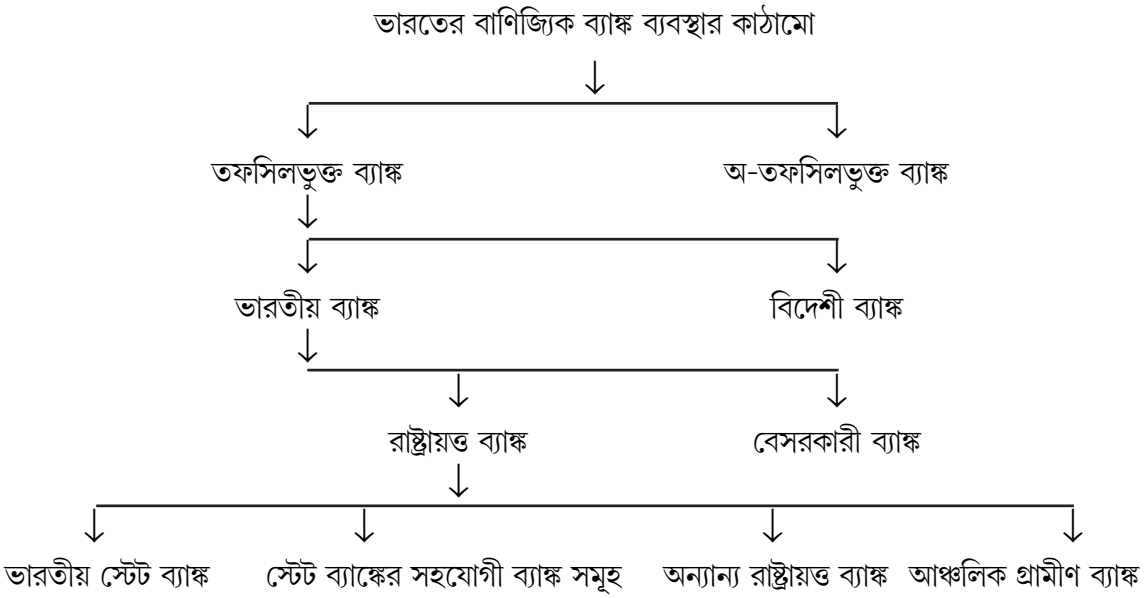

রাষ্ট্রীয় তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

ক. ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী ব্যাঙ্ক সমূহ

১৯৫৫ সালের ১ জুলাই ভারতের সর্বপ্রধান বাণিজ্যিক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ও ভারতের ভূতপূর্ব দেশীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ দ্বারা স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ৯২% শেয়ার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অধিগ্রহণ করায় ব্যাঙ্কটি প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের স্বীকৃতি লাভ করে। স্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্বার্থে একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্থাপন এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটানো।

খ. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

ভারতের বর্তমানে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৯টি, যার মধ্যে ৫০ কোটি বা তার বেশি আমানত সম্পন্ন ১৪টি ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে এবং ৬টি ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় ১৯৮০ সালে। কিন্তু ১৯৯৩ সালে নিউ ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়ার সংযুক্তি ঘটে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে। যার ফলে প্রকৃতপক্ষে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মোট ২০টি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হলেও বর্তমানে তার সংখ্যা ১৯টি। ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

গ. বেসরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

বেসরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়—

১। ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং ২। বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক।

১। ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

বর্তমানে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট তফসিলী ব্যাঙ্ক এবং ১০টি নতুন প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের মোট ৪৭১০টি শাখা নিয়ে বেসরকারি ব্যাঙ্কের কাঠামো গঠিত। বর্তমানে আরো ৩টি বেসরকারি ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাবও অনুমোদন পেয়েছে। ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় এই সমস্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম।

২। বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

বর্তমানে ভারতে ৪১টি বিদেশী ব্যাঙ্ক আছে। এই সমস্ত ব্যাঙ্কগুলির শাখা অফিসগুলি প্রধানত বড় বড় শহরেই অবস্থিত। ভারতের উন্নত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় এই সমস্ত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির যথেষ্ট অবদান আছে। একসময়ে এই সমস্ত ব্যাঙ্কগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন নিয়ন্ত্রণই ছিল না। বর্তমানে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার প্রচলনে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি দেশের জনহিতকর কাজে অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে উঠেছে।

3.7 বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া— অর্থের যোগানের ভূমিকা : আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ হল ঋণ সৃষ্টি। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঋণ সৃষ্টি করতে পারে কিনা সে বিষয়ে অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে। হার্টলে উইদার্স, কেইন্‌স, সেয়ার্স প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। অপরদিকে ওয়াল্টার লীফ্, কান্নান প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঋণ সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণ সৃষ্টি করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দুইভাবে আমানত সৃষ্টি করে। প্রথমত কোনো ব্যক্তি তার সঞ্চয় ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সেই অর্থ জমা নিয়ে আমানতকারীর নামে একটি হিসাব খুলে দেয়। এইভাবে যে আমানত সৃষ্টি হয় তাকে প্রাথমিক আমানত বা প্রকৃত আমানত বা গৌণ আমানত বলে।

দ্বিতীয়ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে পারে। ব্যাঙ্ক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নগদ অর্থে ঋণ না দিয়ে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে একটি হিসাব খুলে ঐ হিসাবে ঋণ অর্থ জমা দেয়। এই ধরনের আমানতকে বলা হয় সৃষ্ট আমানত বা ঋণ আমানত বা উদ্ভূত আমানত বা সক্রিয় আমানত।

প্রাথমিক আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের মোট অর্থের যোগান বাড়ে না, স্থির থাকে কিন্তু উদ্ভূত আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে মোট অর্থের যোগান বাড়ে। সেইজন্যই বলা হয় প্রতিটি ঋণই আমানত সৃষ্টি করে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য কতকগুলি বিষয় অনুমান করা হচ্ছে। অনুমানগুলি হল :

১. দেশের মধ্যে অনেক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আছে।

২. প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ জমা হিসাবে রাখে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তাদের আমানতের যে অংশ নগদ জমা হিসাবে রাখে তাকেই বলা হয় নগদ জমার অনুপাত।

৩. জনসাধারণের নগদ অর্থের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটেছে। ফলে বাড়তি নগদ অর্থ জনসাধারণের কাছে এলে তারা সেই অর্থ কোনো-না-কোনো ব্যাঙ্কে জমা দেয়।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে কোনো অতিরিক্ত নগদ জমা থাকে না অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নগদ জমার অনুপাতের অতিরিক্ত সমস্ত অর্থই ঋণ দেয়।

৫. দেশে ব্যাঙ্ক ঋণের যথেষ্ট চাহিদা আছে।

৬. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে সুদের হারে ঋণ দেয় সেই সুদের হারের কোনো পরিবর্তন হয় না।

এই সমস্ত অনুমানের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হল:

এখানে ধরা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি A ব্যাঙ্কে 1000 টাকা জমা দিল। A ব্যাঙ্কের 1000 টাকার জমাকে বলা হয় প্রাথমিক আমানত বা প্রকৃত আমানত। ব্যাঙ্ক তার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে আমানতকারীরা তাদের আমানতের বা জমার সম্পূর্ণ অংশই একসঙ্গে তোলে না। ফলে মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ জমা হিসাবে হাতে রেখে বাকি অর্থ ঋণ দিলে ব্যাঙ্কের কাজে কোনো অসুবিধা হয় না। এখানে ধরা হচ্ছে নগদ জমা হিসাবে ব্যাঙ্কের হাতে রাখার অনুপাত হল 10 শতাংশ অর্থাৎ দেশে নগদ জমার অনুপাত হল 10%, সুতরাং A ব্যাঙ্ক 1000 টাকার মধ্যে $\left(1000\frac{10}{100}\right)$ 100 টাকা নগদ জমা হিসাবে রেখে বাকি (1000–100) 900 টাকা ঋণ সরবরাহ করবে। A ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যে ব্যক্তি ঋণ নিচ্ছে সে ঐ 900 টাকা খরচ করার ফলে যাদের হাতে আয় হিসাবে ঐ অর্থ পৌঁছালো তারা আবার ঐ অর্থ কোনো না কোনা ব্যাঙ্কে জমা দেবে।

এখানে ধরা হচ্ছে ঐ 900 টাকা B ব্যাঙ্কে জমা পড়ল। B ব্যাঙ্ক আবার ঐ 900 টাকার মধ্যে $\left(900\frac{10}{100}\right)$ 90 টাকা নগদ জমা হিসাবে রেখে বাকি (900–90) 810 টাকা ঋণ সরবরাহ করবে। B ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যে ব্যক্তি ঋণ নিচ্ছে সে ঐ 810 টাকার খরচ করার ফলে ঐ অর্থ যাদের হাতে আয় হিসাবে পৌঁছালো তারা আবার ঐ অর্থ কোনো-না-কোনো ব্যাঙ্কে জমা দেবে। এখানে ধরা হচ্ছে ঐ 810 টাকাই C ব্যাঙ্কে জমা পড়ল। C ব্যাঙ্ক আবার ঐ 810 টাকার মধ্যে $\left(810\frac{10}{100}\right)$ 81 টাকা নগদ জমা হিসাবে রেখে বাকি (810–81) 729 টাকা ঋণ সরবরাহ করবে। এইভাবে চলতে থাকলে দেখা যাবে 1000 টাকা প্রাথমিক আমানতে মোট আমানত হবে (1000 টাকা + 900 টাকা + 810 টাকা + 729 টাকা .....) 10000 টাকা। অর্থাৎ প্রাথমিক আমানতের (10 × 1000 টাকা = 10000 টাকা) 10 গুণ। এই 10কে বলা হয় ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টির গুণক। এই গুণক হল প্রতি এক টাকায় প্রকাশিত নগদ জমার অনুপাতের অন্যোন্যকে (Reciprocal)। এখানে প্রতি এক টাকায় প্রকাশিত নগদ জমার অনুপাত $\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$

এর অন্যোন্যক অর্থাৎ $\frac{1}{\frac{1}{10}}=10$

অর্থাৎ, আমানত সৃষ্টির গুণক হল $\frac{1}{\frac{1}{10}}=10$

সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল। যদি প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ΔM হয়, এবং নগদ জমার অনুপাত যদি হয় তাহলে আমানত সৃষ্টির পরিমাণ (ΔM) হবে $\Delta M=\frac{1}{r}\Delta D$

এখানে আমানত সৃষ্টির গুণক হল $\frac{1}{r}$।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো একটি বিশেষ ব্যাঙ্কের পক্ষে তার প্রাপ্ত আমানতের বেশি অর্থ ঋণ দিতে পারে না বা আমানত সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা একত্রে প্রাথমিক আমানতের কয়েক গুণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে। এইজন্যই বলা হয় ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক ঋণ সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ঋণ সৃষ্টি করতে পারে।

3.8 অনুশীলনী

1. ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
2. ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার একটি চিত্র দিন।
3. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টির পদ্ধতি আলোচনা করুন।
4. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

একক-4 ◆ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া

গঠন

4.1 উদ্দেশ্য

4.2 প্রস্তাবনা

4.3 রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উৎপত্তি

4.4 রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী

কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি

4.5.1 কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের পরিমান গত ঋন নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি

4.5.2 কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের গুনগত ঋণ নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি বা নির্বাচন মূলক ঋণ নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি

4.6 স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির বৈশিষ্ট্য

4.7 অনুশীলনী

4.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে—

- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার ধারনা ও কার্যাবলী
- কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ক কিভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রন করে থাকে।
- স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন আর্থিক নীতীর বৈশিষ্ট্য

4.2 প্রস্তাবনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বস্তুত, ভারতের অর্থ কাঠামোয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। ভারতের টাকার বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও নির্ভর করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর। ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় এবং ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাঙ্ক একদিকে পথনির্দেশক এবং অন্যদিকে নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

4.3 রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উৎপত্তি

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বহুদিন ধরে চলছিল। ১৭৭৩ সালে বাংলার তৎকালীন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার প্রয়াস করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে জেনারেল ব্যাঙ্ক অফ্

বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিলেন। এরপর ১৯১৩ সালে চেম্বারলেন কমিশন একটি রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পেশ করে ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রকাশ করে। ১৯২১ সালে তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক, যেমন ব্যাঙ্ক অফ্ বেঙ্গল, ব্যাঙ্ক অফ্ বোম্বে, ব্যাঙ্ক অফ্ মাদ্রাজ একত্রীকরণের মাধ্যমে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া গড়ে তোলা হয়। ইম্পিরিয়াল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কিছু কিছু কাজ করতে থাকে, যেমন—

১. ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করে এবং

২. অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসেবে কিছু দায়িত্ব পালন করে।

এরপর ১৯২৬ সালে হিলটন ইয়ং কমিশন গঠিত হয়। এর নাম করা হয় রয়াল কমিশন অফ্ ইন্ডিয়ান কারেন্সি অ্যান্ড ফাইনান্স। এই কমিশন 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া' নামে ভারতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়। ১৯৩১ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর জোর দেয়। ১৯৩৩ সালে ''ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কার''-এর ওপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয়। তাতে ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়। ১৯৩৩ সালে ৮ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় আইন সভায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার জন্য একটি বিল আনা হয়। এই বিলটি ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩ সালে এসেম্বলিতে বা সভায় পাশ হয় এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ সালে রাজ্য কাউন্সিলে পাশ হয়। ১৯৩৪ সালের ৫ই মার্চ বিলটি গভর্নর জেনারেল-এর অনুমোদন পায় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া, ১৯৩৪ আইনে পরিণত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১লা এপ্রিল ১৯৩৫ সাল থেকে কাজ শুরু করে। প্রথমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ারহোল্ডারগণের ব্যাঙ্ক হিসেবে গড়ে ওঠে এবং এর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি টাকা। পরবর্তীকালে সরকারের সমষ্টিগত বা আর্থিক নীতি রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে ভারতীয় আর্থিক সর্বাঙ্গীন নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা আনার জন্য ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় মালিকানা হস্তান্তর আইন পাশ করে। এর ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া বেসরকারী ব্যাঙ্ক থেকে একটি রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি ১ তারিখ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ আরম্ভ করে।

4.4 রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী

ক. নোট প্রচলন : 1934 সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 22 নং ধারা অনুযায়ী ভারতে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নোট প্রচলনের জন্য নোট প্রচলন দপ্তর নামে একটি পৃথক দপ্তর রয়েছে।

1 টাকার কাগজি মুদ্রা ও অন্যান্য ধাতব মুদ্রা ছাড়া সমস্ত কাগজি মুদ্রা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রচলন করে থাকে। ভারতে বর্তমানে 1 টাকা, 2 টাকা, 5 টাকা, 10 টাকা, 20 টাকা, 50 টাকা, 100 টাকা, 200 টাকা, 500 টাকা ও 2,000 টাকার কাগজি মুদ্রার প্রচলন রয়েছে। 1 টাকার কাগজি মুদ্রা প্রচলন করার ক্ষমতা সরকারের উপর অর্পণ করা হয়েছে। তবে ধাতব মুদ্রা এবং 1 টাকার কাগজি মুদ্রা কেন্দ্রীয় সরকার প্রচলন করলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জনসাধারণের কাছে সেগুলি প্রচার করে।

যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী, তথাপি ইচ্ছামতো যে কোনো ধরনের নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাপাতে পারে না। সে বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আইনের সংশোধনীও হয়েছে। সেই সংশোধনী হল :

নোট প্রচলন

		নিয়ম ও সংশোধন
1934 সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে	→	40% স্বর্ণ ও সিকিউরিটি সংরক্ষণ রাখতে হবে। সোনার পরিমাণ কখনোই 40 কোটি টাকার নিচে থাকবে না।
1956 সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সংশোধনী) আইন	→	নূন্যতম 115 কোটি টাকার স্বর্ণ ও 400 কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ রাখতে হবে।
1957 সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সংশোধনী) আইন	→	200 কোটি টাকার সংরক্ষণ রাখতে হবে। তার মধ্যে কমপক্ষে 115 কোটি টাকা স্বর্ণে ও 85 কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় রাখতে হবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে বৈদেশিক মুদ্রা জমা না রেখেই নোট ছাপতে পারবে।

খ. কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ব্যাঙ্কার : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের ও রাজ্য সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে (জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত)। নিম্নলিখিত কাজগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষে করে থাকে—

১. **অর্থ গ্রহণ :** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষে অর্থগ্রহণ করে থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা অফিসে জনসাধারণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নামে যে অর্থ জমা দেয় সেই অর্থ ব্যাঙ্ক গ্রহণ করে হিসাব রাখে।

২. **অর্থ প্রদান :** বিভিন্ন খাতে সরকার যে সমস্ত অর্থ ব্যয় করে থাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সেই অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদান করে। তার পরিবর্তে ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট কমিশন পায়।

৩. **সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় :** সরকার বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের পক্ষে ঋণপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে।

৪. **ঋণ ব্যবস্থা পরিচালনা :** বিভিন্ন সময়ে ঋণব্যবস্থা কীভাবে চালিত হবে সে বিষয়ে সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণব্যবস্থা পরিচালনা করতে সরকারকে সাহায্য করে।

৫. **ঋণদাতা :** সরকার বিভিন্ন প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের প্রয়োজনে ঋণ দিয়ে সাহায্য করে।

৬. **বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয় :** বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারের তরফে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাবতীয় কাজকর্ম করে থাকে।

৭. **অর্থস্থানান্তর :** সরকারের পরামর্শদাতা সরকারের অর্থ স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই কাজ সম্পন্ন করে। শুধুমাত্র দেশের মধ্যে অর্থ স্থানান্তর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করে না, বিদেশি মুদ্রায় সরকারের বিভিন্ন প্রয়োজনে অর্থ স্থানান্তর করে।

৮. **পরামর্শদাতা :** ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় সহায়তা, উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। ফলে সরকারের ব্যাঙ্কিং বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ সহায়তা করে।

৯. **সংযোগকারী :** বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ সরকারের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করে থাকে। সংযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই ব্যাঙ্কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

১০. **প্রতিনিধি :** ট্রেজারি বিলের মাধ্যমে সরকার স্বল্পমেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করে থাকে। সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাঙ্ক এই কাজ করে। ট্রেজারি বিলগুলির পুনর্বাট্টার কাজও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্পাদন করে। 364 দিনের ট্রেজারি বিলের মাধ্যমে 2012-13 সালে 1,04,371 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। সরকারের বাজারের থেকে ঋণের প্রায় 15% এই ট্রেজারি বিলের থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

১১. **আর্থিক নীতি :** ১৯৯২ সালের ১ অক্টোবরে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ্যন্তরীণ ঋণ ব্যবস্থাপনা সেল নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করে। এই সেল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল—

(i) সার্বিক আর্থিক নীতির অংশ হিসাবে অভ্যন্তরীণ ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং তার ক্ষেত্রে সঠিক নীতি প্রণয়ণ করা।

(ii) সরকার সিকিউরিটি বাজারকে সচল ও প্রসারিত করা। নানাভাবে অভ্যন্তরীণ ঋণ ব্যবস্থাপনার কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করে থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি বিষয়ক কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১২. **উপায় ও উপকরণ :** সরকারের রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান থাকে সেই সময় ব্যবধান পূরণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অগ্রিম উপায় ও উপকরণ দিয়ে সরকারকে সাহায্য করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে সরকারের আর্থিক নীতি, ঋণদান, অর্থ গ্রহণ, পরামর্শদাতা ও বিভিন্নভাবে যে কাজ করে থাকে, সেই কাজ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের কাছ থেকে কমিশন পেয়ে থাকে।

গ. বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার : ভারতে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা স্বীকৃত ও নিয়ন্ত্রিত। তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বিল পুনর্বাট্টা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনে তাদের আর্থিক সাহায্য ও অনুমোদিত নিরাপত্তাপত্রের বিনিময়ে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান করে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে আদায়ীকৃত মূলধনের ন্যূনতম 3% রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে হয়। এছাড়া তাদের মোট আমানতের বর্তমানে 25% নগদে, সোনায় অথবা অনুমোদিত ঋণপত্রে নিজেদের কাছে জমা রাখতে হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ও অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি যখন আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হয় তখন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণপত্র, জামিন রেখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে সাহায্য করে থাকে। এইজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে শেষ

পর্যায়ের ঋণদাতাও বলা হয়।

ঘ. ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অভিভাবক ও নিয়ামক : 1934 সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন এবং 1949 সালের ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কের উপর তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আরোপ করা হয়েছে। নতুন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লাইসেন্স প্রদান করে। কোনো ব্যাঙ্কের নতুন শাখা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম ও পদ্ধতিগুলি পর্যালোচনা করে।

এই সমস্ত কাজকর্ম পরিদর্শন পর্যালোচনা করার জন্য 1994 সালে 'বোর্ড অফ সুপারভিশন' নামে একটি বোর্ড গঠিত হয়েছে। এছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যপদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কেমনভাবে পরিচালিত হবে সেজন্য বোর্ড অফ ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, নরসিমহম কমিটি, জানকীরাম কমিটি তাদের সুনির্দিষ্ট মতামত পরামর্শ দিয়েছে।

ঙ. বিনিময় হারের স্থায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ রক্ষা : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল অর্থের বাহ্যিক মূল্যের স্থায়িত্ব বজায় রাখা। বিনিময় নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য বৈদেশিক বিনিময়ের চাহিদাকে যোগানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ন্ত্রণ করা। এই কাজে সহায়তার জন্য ১৯৭৩ সালে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হয়। বর্তমানে এই আইনের পরিবর্তন হয়েছে। এখন বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন নামে নতুন আইন প্রবর্তিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় আইনের স্থায়িত্ব রক্ষা, বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনা করা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম কাজ।

চ. পরিকল্পনা রূপায়ণে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের পূর্বে ব্যাঙ্ক আলাদা কৃষিঋণ বিভাগের মাধ্যমে কাজ করত। 1982 সালে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক (NABARD) প্রতিষ্ঠার পর অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভূত পরিমাণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সহায়তা করছে। এ ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, লিড ব্যাঙ্ক পরিকল্পনা গ্রহণ, গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তার, কৃষিক্ষেত্রে ঋণের জোগান বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ সঞ্চয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি করে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ছ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ : দেশে সুষ্ঠু আর্থিক নীতি প্রণয়ন এবং মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন প্রতিহত করার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দেশের আর্থিক পরিস্থিতি অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদের হার হ্রাসবৃদ্ধি করতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাধারণত— ক) ব্যাঙ্ক রেট হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, খ) আবিশ্যিক জমার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, গ) প্রয়োজন অনুযায়ী খোলা বাজারে ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয় করে ঋণের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ঘ) নির্বাচিত পণ্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে করে থাকে।

জ. অনুসন্ধান ও সমীক্ষা : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেহেতু দেশের আর্থিক ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে, সেহেতু আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন বিষয় সঠিকভাবে অনুসন্ধানের চেষ্টা করে, যার

মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সহজেই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারে।

ঝ. উন্নয়নমূলক কাজ : চিরাচরিত ধরনের কাজগুলি ছাড়াও ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কৃষি, শিল্প ও রপ্তানির প্রসারে অর্থসংস্থান ব্যবস্থার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করতে হয়, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ক) শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণের সংস্থান, খ) বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে প্রয়োজনীয় ঋণের সংস্থান, গ) গৃহঋণের সংস্থান, ঘ) কৃষিঋণের সংস্থান, ঙ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চ) অভিযোগ নিষ্পত্তি।

সুতরাং, ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজের গুরুত্ব ও পরিধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রণের এককটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। যদিও কোথাও কোথাও এর কার্যকলাপ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে সর্বত্র এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তবে সামগ্রিকভাবে এই ব্যাঙ্ক ভারত সরকারের বিভিন্ন বিষয়েও দেশে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃত।

4.5 কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

যে ব্যাঙ্ক দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে থেকে অর্থের বাজারকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলে।

ঋণভিত্তিক আধুনিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণ দেশে মোট অর্থ যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ সৃষ্টি করে মুদ্রাস্ফীতি সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ কমানোর চেষ্টা করে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ কমানোর চেষ্টা করে। ঠিক একইভাবে প্রয়োজনের তুলনায় ঋণের পরিমাণ কম হলেও মুদ্রা সংকোচন (যখন দেশের দামস্তর ক্রমাগতভাবে কমতে থাকে) সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ বৃদ্ধির চেষ্টা করে অর্থাৎ মুদ্রাসংকোচনের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করে। এইজন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঋণ নিয়ন্ত্রণ। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ সৃষ্টি করে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সকল পদ্ধতি গ্রহণ করে তাকে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণত যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল ক) পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং অপরটি হল খ) গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা নির্বাচনমূল ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এই দুই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

4.5.1 কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের মোট পরিমাণ বা মোট যোগান বাড়ায় বা কমায় তাকে বলে পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে আবার

তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় ঃ যেমন বাট্টার হার বা ব্যাঙ্ক রেট, খোলা বাজার কার্যকলাপ এবং পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত। এই তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. বাট্টার হার বা ব্যাঙ্ক রেট : কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর ঋণপত্র জমা রেখে বা প্রথম শ্রেণীর বিল পুনর্বাট্টা করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে যে নিম্নতম বাট্টার হারে অর্থ ঋণ দেয় সেই হারকে বলে বাট্টার হার বা ব্যাঙ্ক রেট। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক রেট হল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার। এই ব্যাঙ্ক রেট পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

আবার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যে সুদের হারে জনসাধারণকে অর্থ ঋণ দেয় তাকে বাজারে সুদের হার বলে। ব্যাঙ্ক রেটের সঙ্গে বাজারে সুদের হারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক রেট বাড়লে বাজারে সুদের হার বাড়ে এবং ব্যাঙ্ক রেট কমলে বাজারে সুদের হার কমে।

অর্থনীতিতে যখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় অর্থাৎ যখন দ্রব্য ও সেবার তুলনায় জনসাধারণের আর্থিক আয় বেশি থাকে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দেশের ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে দেয়। ব্যাঙ্ক রেট বাড়ার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঋণপত্র পুনর্বাট্টা করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কম পরিমাণ নগদ অর্থ পায় ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। তাছাড়া ব্যাঙ্ক রেট বাড়ার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সুদের হার অর্থাৎ বাজারে সুদের হারও বেড়ে যায়, ফলে জনসাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কম পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতির সময় ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করে।

অপরপক্ষে অর্থনীতিতে যখন মুদ্রা সংচোন দেখা দেয় অর্থাৎ যখন দ্রব্য ও সেবার তুলনায় জনসাধারণের আর্থিক আয় কম থাকে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রেট কমিয়ে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে মুদ্রা সংকোচন প্রতিরোধ করে।

২. খোলা বাজার কার্যকলাপ : দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খোলা বাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করা এবং খোলা বাজার থেকে সরকারি ঋণপত্র কিনে নেওয়াকে বলে খোলা বাজার কার্যকলাপ। খোলা বাজার কার্যকলাপের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

অর্থনীতিতে যখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় অর্থাৎ যখন দ্রব্য ও সেবার তুলনায় জনসাধারণের আর্থিক আয় বেশি থাকে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলা বাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে। এই সরকারি ঋণপত্র যারা কিনে থাকে তাদের ঐ ঋণপত্রের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অর্থ দিতে হয়। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নগদ আমানতের পরিমাণ কমে। কারণ যারা ঋণপত্র কেনে তারা সাধারণত নিজ নিজ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাও কমে যায়। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতির সময় খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রি করে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করে।

অপরপক্ষে অর্থনীতিতে যখন মুদ্রা সংকোচন দেখা দেয় অর্থাৎ যখন দ্রব্য ও সেবার তুলনায় জনসাধারণের আর্থিক আয় কম থাকে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলা বাজারে ঋণপত্র ক্রয় করে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে মুদ্রা সংকোচন প্রতিরোধ করে।

৩. **পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত :** আইনত ও প্রথাগতভাবে প্রতিটি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তাদের আমানতের শতকরা যত অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে বাধ্য হয় তাকে বলে নগদ জমার অনুপাত। ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন করার পদ্ধতিকে বলে পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের আমানতের যে নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে নগদ জমা হিসাবে রাখতে হয় সেটি অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অর্থনীতিতে যখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় অর্থাৎ যখন দ্রব্য ও সেবার তুলনায় জনসাধারণের আর্থিক আয় বেশি থাকে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নগদ জমার অনুপাত বাড়িয়ে দেয়। নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে তাদের আমানতের বেশি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে হয়, ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে নগদ আমানতের পরিণাম কমার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাও কমে যায়। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতির সময় নগদ জমার অনুপাত বাড়িয়ে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করে।

অপরপক্ষে অর্থনীতিতে যখন দেখা দেয় অর্থাৎ যখন দ্রব্য সেবার তুলনায় আর্থিক আয় কম থাকে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নগদ জমার অনুপাত কমিয়ে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে মুদ্রাসংকোচন প্রতিরোধ করে।

4.5.2 কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা বিচারমূল পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রেই ঋণের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয়। কিন্তু পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কমানো এবং একই সঙ্গে অন্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয় না। সেইজন্যই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বাড়ানো এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। দেশের মধ্যে নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণের নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণের সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পদ্ধতি গ্রহণ করে তাকে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ বা বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা অর্থনীতির নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণকে বলে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির আবার বিভিন্ন ভাগ আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি আলোচনা করা হল ঃ

১. **নগদ অংশ বা মার্জিনের উপর নিয়ন্ত্রণ :** সাধারণভাবে শেয়ার বাজারে ফাটকার কাজে ব্যবহৃত ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মার্জিনের বা নগদ অংশের পরিবর্তন করে থাকে। শেয়ার বা ঋণপত্র বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণের সময় ঋণ গ্রহণকারীকে যে পরিমাণ অর্থ নগদে জমা দিতে হয় তাকে বলে নগদ অংশ বা মার্জিন। যদি কোনো ঋণের ক্ষেত্রে মার্জিন 30% হয় তাহলে ঋণগ্রহণকারীকে 30% অর্থ নগদে দিতে হয় এবং বাকি 70% অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ হিসাবে পায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ফাটকা কারবারে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তাহলে মার্জিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, অপরপক্ষে ফাটকা কারবারে ঋণের পরিমাণ যদি কোনো কারণে বাড়াতে চায় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মার্জিনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

২. **ভোগকারীর ঋণ নিয়ন্ত্রণ :** স্থায়ী ভোগদ্রব্য (মোটর গাড়ি, ফ্রিজ, টেলিভিশন ইত্যাদি) কেনার জন্য অনেক সময় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত দ্রব্য কেনার সময় প্রথমে কিছু অর্থ নগদে দিতে হয় তারপর বাকি অর্থ কয়েকটি কিস্তিতে শোধ করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপ করে। যেমন, মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেয় নগদ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে এবং কিস্তির সংখ্যা কমিয়ে দেয় যাতে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। অপরপক্ষে মুদ্রাসংকোচনের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেয় নগদ অর্থের পরিমাণ কমিয়ে এবং কিস্তির সংখ্যা বাড়িয়ে, এই উদ্দেশ্যে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে মুদ্রা সংকোচন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে।

৩. **বৈষম্যমূলক বাট্টার হার বা ব্যাঙ্ক রেট :** কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর ঋণপত্র জমা রেখে বা প্রথম শ্রেণীর বিল পুনর্বাট্টা করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে যে নিম্নতম বাট্টার হারে অর্থ ঋণ দেয় সেই হারই হল বাট্টার হার বা ব্যাঙ্ক রেট। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ঐ সমস্ত ক্ষেত্রের ঋণপত্রের জন্য ব্যাঙ্ক রেট কমিয়ে দেয় অপরপক্ষে অন্য কোনো ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঐ সমস্ত ক্ষেত্রের ঋণপত্রের জন্য ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে দেয়।

৪. **ঋণ বরাদ্দ পদ্ধতি :** নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণের বরাদ্দ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়। তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কী পরিমাণ ঋণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পেতে পারে তাও স্থির করে দেয়। যেমন কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্পে সর্বোচ্চ কী পরিমাণ ঋণ দেওয়া যাবে সেই ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিতে পারে।

৫. **নৈতিক প্রণোদন বা নৈতিক উপরোধ :** কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে উপরোধ করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে বলে এবং বিপদের সময় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে রক্ষা করে বলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এই অনুরোধ-উপরোধের মর্যাদা দিয়ে থাকে। নৈতিক প্রণোদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুরোধ-উপরোধ মানার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছে আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকলেও এই অনুরোধ-উপরোধ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রক্ষা করবে এই আশায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে।

৬. **প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা :** যে সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির বিপক্ষে যায় সেই সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখানে বাণিজ্যিক

ব্যাঙ্কের বিনিময় বিল, সরকারি ঋণপত্র ইত্যাদি ভাঙিয়ে না দিতে পারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে আগাম দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারে।

4.6 স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল লক্ষ্য আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা হলেও ১৯৫১ সালে পরিকল্পিত উন্নয়নের যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নশীল অর্থনীতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঋণের সংস্থান করার দায়িত্বও তার উপর বর্তায়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতিগুলিকে আলোচনার জন্য স্বাধীনতার পর থেকে, অর্থাৎ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত পর্বকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এই তিনটি পর্যায়ে আর্থিক নীতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হল—

ক. প্রথম পর্যায়

১৯৫০-৭২ সাল পর্যন্ত সময়কালকে প্রথম পর্যায় ধরা হয়। এই সময়ের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুসৃত নীতিটি নিয়ন্ত্রিত প্রসারণমূলক নীতি নামে পরিচিত।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক উন্নতিকে সুনিশ্চিত করতে ১৯৫০ সাল থেকে ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তন হয়। সেই সময় থেকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতিতে কাজ করে চলেছে।

এই সময় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল। ঋণের পরিমাণ যেন অত্যাধিক বৃদ্ধি না পায় তার জন্য ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর দায়িত্ব বর্তায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরু থেকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কগুলির ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। অর্থাৎ, এই সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণের সঙ্কোচন করা। আবার কতকগুলি ক্ষেত্র, বিশেষত বিভিন্ন শিল্পের ও প্রতিরক্ষার উন্নয়নের জন্য ঋণ সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করা হয়।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তখন ব্যাঙ্ক হার পরিবর্তন, নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন ও নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করে। সেই নীতির পরিবর্তনগুলি হল ঃ

১. **ব্যাঙ্ক হার পরিবর্তন :** মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 1951 সালের নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্ক হার 3% থেকে বৃদ্ধি করে 3.5% করে। 1957 সালে এই হার আরো বৃদ্ধি করে 4%-এর নিয়ে যায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলাকালীন মুদ্রাস্ফীতি সমস্যার কোনো সমাধান না হওয়ায় 1963 সালের জানুয়ারী মাসে ব্যাঙ্ক হার বৃদ্ধি পেয়ে 4.5% করা হয়। 1964 ও 1965 সালে ব্যাঙ্ক হার আরো বৃদ্ধি পেয়ে 5% ও 6% হয়। যেহেতু ব্যাঙ্ক হার বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দেয় ঋণের জন্য সুদের হারও বৃদ্ধি পায়, সেহেতু ব্যাঙ্ক হার বৃদ্ধি করে মোট ঋণের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল, যাতে দেশে দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

২. **নগদ-জমা অনুপাত :** 1956 সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নগদ-জমা অনুপাত পরিবর্তন করার

কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য 1964 সালের সেপ্টেম্বর মাসে নগদ-জমা অনুপাত 20% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 25% করা হয়। ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল এই বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্য।

৩. **নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ :** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু থেকে নির্বাচনমূলক ঋণনীতি অনুসরণ করে। এই সময় ব্যাঙ্ক ঋণের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে অর্থের যোগানের বার্ষিক বৃদ্ধির হার 8.2%-এ দাঁড়ায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বৃদ্ধির হার 9.1% হয়। অথচ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার সেইভাবে বৃদ্ধি পায়নি। অনেকে ঐ সময় দামস্তরের হার বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ অর্থের যোগান বলে মনে করেন। তবে 1966 সালে ভারতে সবুজ বিপ্লব দেখা দেওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

খ. দ্বিতীয় পর্যায়

1972-91 সাল পর্যন্ত সময়কালকে দ্বিতীয় পর্যায় বলা হয়। এই সময়কে সংস্কার-পূর্ব সময়ের আর্থিক নীতি বলা যায়।

1972-74 সাল সময় পর্যন্ত ভারতের অর্থনীতিতে দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় ছিল না। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতি প্রশমনের জন্য পূর্বের তুলনায় আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে কঠোরতা আনে। এই সময় সরকারের রাজস্ব নীতির বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর্থিক নীতি গ্রহণ করে।

1972-91 সাল সময় পর্যন্ত প্রশাসনিক সুদের হার প্রচলিত থাকার জন্য নগদ জমার অনুপাত 25% বৃদ্ধি করা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তবে খোলা বাজারে কারবারের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অতিরিক্ত তারল্য রোধ করা সম্ভব হয়নি। ঐ সময় বিধিবদ্ধ জমার অনুপাতের সর্বোচ্চ সীমা 38.5% পর্যন্ত হয়েছিল সরকারের অর্থের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। আশির দশকের শেষ দিকে এবং নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে সরকারি ঋণপত্রের উপর সুদের হার বাজার সুদের হারের সমান হয়।

গ. তৃতীয় পর্যায়

1991 সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময় হল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংস্কারোত্তর পর্যায়।

1991-92 সাল থেকে ভারত সরকার আর্থিক ও কাঠামোগত সংস্কারনীতি অনুসরণ করে। এই সময় থেকে সরকার ভারতীয় পরিকল্পিত অর্থনীতিকে বাজারমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তরে প্রয়াসী হয়। ভারতীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থা থেকে বিমুক্ত করে 'উদারীকরণ অর্থনীতি' রূপান্তরের প্রচেষ্টা শুরু হয়। দেশে শিল্প নীতি, বাণিজ্য-নীতি, বৈদেশিক বিনিময় হার নীতি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়।

তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর্থিক নীতিতে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘোষণা করে সেগুলি হল ঃ

১. খোলা বাজারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী-র নেতৃত্বে আর্থিক সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সরকারি ঋণপত্রগুলিতে সুদের হার বৃদ্ধির

জন্য সুপারিশ করে।

২. অগ্রাধিকারযুক্ত ক্ষেত্র, যেমন ঃ কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, রপ্তানিতে সরকার নিয়ন্ত্রিত কম সুদের বিনিময়ে ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অন্যদিকে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে উচ্চ সুদের হার নির্ধারিত হয়।

৩. 1994 সালের অক্টোবর মাস থেকে 2 লক্ষের বেশি টাকা ঋণের জন্য সুদের হারকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে ন্যূনতম সুদের হারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

৪. 1995 সালের অক্টোবর মাস থেকে সরকারি ও বেসরকারি সিকিউরিটির জন্য সরকারি নিয়ম শিথিল করা হয়। সুদের হার বাজার দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৫. মুদ্রাস্ফীতি দমনের জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 1991 সালের জুলাই মাসে ব্যাঙ্ক রেটের পরিবর্তন করে। 1991 সালের আগে ব্যাঙ্ক রেট 10% ছিল। 1991 সালের জুলাই মাসে বাড়িয়ে 11% এবং পরে 12% করা হয়।

1995 সাল থেকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি অনেক সহজতর হয়। 1998 সালের এপ্রিল মাসে নরসিমহম কমিটির সুপারিশে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে।

সেই পরিবর্তনগুলি হল ঃ

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির স্বতন্ত্রতা।

খ. ব্যাঙ্কের কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে পেশাগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. বিদেশী ব্যাঙ্ককে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় প্রবেশের অনুমতি দিয়ে প্রতিযোগিতার পরিবেশ বৃদ্ধি।

ঘ. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রধান হাতিয়ার নগদ-জমার অনুপাতের উপর ধীরে ধীরে নির্ভরশীলতা হ্রাস।

ঙ. সরকারের তহবিল সংগ্রহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাতের উপর গুরুত্ব হ্রাস এবং বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত কমিয়ে দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে লাভজনক দিকে সেই অর্থ চালনা।

চ. অর্থের বাজারের চাহিদা ও যোগানশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত সুদের হারের মাধ্যমে সুদ কাঠামোর পুনর্গঠন।

ছ. অপেক্ষাকৃত কম সুদের হারে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণের প্রসার।

এই পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—

১. নগদ জমার অনুপাত 1998 সালের এপ্রিল মাসে কমিয়ে 10% করে। 2001 সালের অক্টোবর মাসে এই অনুপাত আরো কমে 5.5% হয়েছে। 2003 সালের 16 জুন থেকে এই হার কমে 4.5% হয়েছে। বর্তমানে এই হার 4.0% হয়েছে (2018 সালে)।

২. ব্যাঙ্ক রেট 1991 সালের অক্টোবর মাসে 12% থেকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 1999 সালের এপ্রিলে 8% করে, বর্তমানে ব্যাঙ্ক রেট 6.5% হয়েছে। বর্তমানে (2018 সালে) এই ব্যাঙ্করেট এর

হার হয়েছে 6.25% হয়েছে।

৩. ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত 1990 সালের সেপ্টেম্বর মাসে 38.5% থেকে ধীরে ধীরে কমিয়ে 1997 সালের সেপ্টেম্বর মাসে 25% করেছে। এটি 7 নভেম্বর 2008 পর্যন্ত ছিল। বর্তমানে এই বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত হার হল 19.5%।

৪. ক্ষুদ্র ঋণ প্রার্থীদের ঋণের সমস্যা দূর করতে প্রধান সুদের হারে 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৫. মেয়াদী আমানতের বিনিময়ে প্রধান সুদের হার অথবা তার তুলনায় কম হারে অগ্রিম মঞ্জুরের ব্যবস্থা হয়েছে।

৬. শিল্পক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণে উৎসাহ দিতে শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের বিনিময়ে ব্যক্তিগত অগ্রিম ঋণের উর্ধ্বসীমা 10 লক্ষ টাকা থেকে 20 লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

4.7 অনুশীলনী

1. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ভূমিকার পরিচয় দিন।
2. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিবিধ কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন।
3. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজগুলির পরিচয় দিন।
4. রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কেন কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারের ব্যাঙ্কার বলা হয়?
5. স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি গুলি আলোচনা করুন।

একক-5 ◆ টাকার বাজার

গঠন

5.1 উদ্দেশ্য

5.2 প্রস্তাবনা

5.3 টাকার বাজারের ধারনা ও বৈশিষ্ট্য

5.4 টাকার বাজারের শ্রেণীবিভাগ

5.5 তলবী অর্থের বাজার

5.5.1 তলবী টাকার বাজারের উদ্দেশ্য

5.5.2 তলবী টাকার বাজারের সুবিধা

5.5.3 ভারতীয় তলবী টাকার বাজারের অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

5.6 ট্রেজারি বিল বাজার

5.7 প্রতায়ন আমানত

5.8 বাণিজ্যিক কাগজ

5.9 ভারতীয় টাকার বাজারের সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি

5.10 অনুশীলনী

5.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে—

- টাকার বাজার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
- ট্রেজারী বিল বাজারের কার্যকলাপ
- প্রত্যয়ন আমানতের ধারণা
- বাণিজ্যিক বাজারের ধারণা
- তলবী টাকার বাজারের ধারণা
- ভারতীয় টাকার বাজারের সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি

5.2 প্রস্তাবনা

টাকার বাজার বলতে এমন একটি ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে একাধিক ঋনগ্রহীতা স্বল্পমেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করতে পারে ও অন্যদিকে ঋণদাতা তার অর্থের জন্য উপযুক্ত ঋণগ্রহীতার সন্ধান পায়। অর্থাৎ টাকার বাজার হল এমন একটি বাজার যেখানে স্বল্পমেয়াদী তহবিলের ঋণ এর আদান প্রদান ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টাকার বাজারে কখনই নগদ টাকায় লেনদেন ঘটে না। লেনদেন বা আদান প্রদান ঘটে বাণিজ্যিক হুণ্ডি, প্রতিশ্রুতিপত্র, সরকারী ঋণপত্র, ইত্যাদির মাধ্যমে।

5.3 টাকার বাজারের ধারনা ও বৈশিষ্ট্য

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এর মতে ''টাকার বাজার হল স্বল্পমেয়াদী আর্থিক সম্পদের লেনদেন কেন্দ্র। টাকার বাজারে ঋণগ্রহীতার স্বল্পমেয়াদী অর্থের প্রয়োজন মেটে ও ঋণদাতা তরলত্ব বা নগদ অর্থ অর্জন করে। এটি এমন একটি স্থান যেখানে আর্থিক ও অন্যান্য সংস্থা এবং কোন ব্যক্তির স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগযোগ্য তহবিল ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা আহৃত হয়। এই ঋণগ্রহীতা কোন সংস্থা হতে পারে, কোন ব্যক্তি হতে পারে কিংবা সরকারও হতে পারে।''

এম. ওয়াই খান এর মতে, ''টাকার বাজার বলতে সেই বাজারকে বোঝায় যেখানে স্বল্পকালীন তহবিল, স্বল্পকালীন টাকা, এবং আর্থিক সম্পদ যেগুলি টাকার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাদের লেনদেন ঘটে। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে স্বল্পকালীন সময় বলতে এক বছর পর্যন্ত বোঝায়। টাকার পরিবর্তে সম্পদ বলতে বোঝায় সামান্য খরচের বিনিময়ে মূল্যের ক্ষতি না করে যে সমস্ত সম্পদগুলিকে দ্রুত নগদ টাকায় পরিণত করা যায়।'' টাকার বাজারের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

১. **উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপস্থিতি :** উন্নত টাকার বাজারের অবস্থান করে উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। প্রতিটি দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই সামগ্রিকভাবে টাকার বাজার নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

২. **টাকার বাজারের গঠন :** টাকার বাজার একটি সংগঠিত বাজার। এই বাজার মূলত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, ডিসকাউন্ট হাউস, বিল মার্কেট নিয়ে গঠিত। ভারতের টাকার বাজারের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো হল : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, ইত্যাদি।

৩. **সুসংহত ও অসংহত টাকার বাজার :** টাকার বাজার সুসংহত হলে তাকে সংগঠিত টাকার বাজার বলে। কিন্তু টাকার বাজারের একটি অংশ অসংহত বা অসংগঠিত হতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নিয়ে সংগঠিত বাজার গড়ে উঠেছে। মহাজন, সাহুকর, স্রফ শ্রেষ্ঠী এবং অন্যান্য দেশীয় ব্যাঙ্ক অসংগঠিত টাকার বাজারের অঙ্গ।

৪. **ব্যাঙ্ক, ডিসকাউন্ট হাউস, ইত্যাদির অস্তিত্ব :** সংগঠিত টাকার বাজারে প্রয়োজনের অনুপাতে সঠিক সংখ্যায় ব্যাঙ্ক, ডিসকাউন্ট হাউস ইত্যাদি প্রয়োজন। ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়।

৫. **টাকার বাজারের পরিধি :** টাকার বাজার, শহর, শহরতলিতে ও গ্রামে প্রসারিত হতে হবে। তা না হলে অসংগঠিত টাকার বাজার গড়ে উঠবে। ভারতে ব্যাঙ্ক ও ডিসকাউন্ট হাউসগুলোর অধিকাংশই শহরে ও শহরতলিতে অবস্থিত। এই কারণে গ্রামাঞ্চলে অসংগঠিত টাকার বাজারের উপদ্রব দেখা যায়।

৬. **অভিন্ন সুদের হার :** সংগঠিত টাকার বাজারে সুদের হার সর্বত্র সমান হয়। টাকার বাজার অসংগঠিত হলে সুদের হারের তারতম্য ঘটে এবং ঋণগ্রহীতা শোষিত হতে পারে।

৭. **আর্থিক সংস্থান :** সুসংগঠিত টাকার বাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্বল্প-মেয়াদী ঋণদানের জন্য যথেষ্ট আর্থিক সংস্থান থাকা। কিন্তু ভারতের ব্যাঙ্কগুলোর পুনর্বাট্টাযোগ্য সম্পদের পরিমাণ খুবই কম। এই কারণে ভারতের টাকার বাজারের আর্থিক সংস্থান প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

৮. **বৈদেশিক ব্যাঙ্কের প্রভাব :** বিদেশী ব্যাঙ্কগুলো প্রধানত বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের কাজ করে। টাকার বাজারে এদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এসব ব্যাঙ্ক যদি সঠিকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে এরা একচেটিয়া ক্ষমতা ভেদ করে। ভারতের ক্ষেত্রে বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলো একদিকে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও অংগ্রহণ করে।

৯. **স্বল্প মাথাপিছু আমানত :** ভারতের সঞ্চয়ের হার খুবই স্বল্প। বেশিরভাগ লোকের, বিশেষ করে গ্রামের লোকেদের ব্যাঙ্কে অর্থ জমাবার প্রবণতা খুবই কম। এই কারণে ভারতে মাথাপিছু আমানতের হার খুব কম। ভারতীয় টাকার বাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আমানতের স্বল্পতা ও তরল সম্পদের অভাব।

১০. **মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব :** ভারতীয় টাকার বাজার মুদ্রাস্ফীতি কারণে প্রায়ই অস্থির হয়। মুদ্রাস্ফীতির হারের প্রায়শ পরিবর্তন টাকার বাজারের কার্যকলাপের মসৃণতায় বাধা সৃষ্টি করে।

5.4 টাকার বাজারের শ্রেণীবিভাগ

সময়ের দিক থেকে বিচার করে টাকার বাজারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় - (১) স্বল্পকালীন বা তলবি ঋণ বাজার, (২) মাঝারিকালীন ঋণ বাজার এবং (৩) দীর্ঘকালীন ঋণ বাজার।

১। স্বল্পকালীন বা তলবি ঋণ বাজার (Short-term or Call Loan Market) ঃ যে সকল ঋণ মাত্র কয়েক দিনের জন্য দেওয়া হয় এবং চাওয়ামাত্র যা পরিশোধ করতে হয় তাকে **তলবি ঋণ বাজার** (Call Loan Market) বলা হয়। চাওয়ামাত্র এই ঋণ ফেরত পাওয়া যায় বলে একে 'Money at Call and Short Notice'-ও বলা হয়। যে সুদে এই ঋণ নেওয়া হয় তাকে **তলবি হার** (Call Rate) বলা হয়। লন্ডনের হুণ্ডির দালালরা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এই জাতীয় ঋণ গ্রহণ করে হুণ্ডির ব্যবসা পরিচালনা করে এবং আমেরিকার শেয়ার দালালরা এই জাতীয় ঋণ গ্রহণ করে **ফটকা কারবার** (Speculations Business) করে। ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের জন্য প্রধানত এই ধরনের ঋণ নিয়ে থাকে।

২। মাঝারিকালীন ঋণ বাজার (Middle-term Loan Market) ঃ যে বাজারে কয়েক মাসের জন্য (অন্তত তিন মাস) ঋণ প্রদান করা হয়, তাকে মাঝারিকালীন ঋণ বাজার বলে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বিল ভাঙিয়ে এই জাতীয় ঋণ প্রদান করে। শিল্পপতিরা কাঁচামাল ক্রয় করার জন্য অথবা শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের জন্য এই জাতীয় ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

৩। দীর্ঘকালীন ঋণ বাজার (Long-term Loan Market) ঃ যে বাজারে দীর্ঘ সময়ের জন্য (সাধারণত কয়েক বছর) ঋণ প্রদান করা হয়, তাকে দীর্ঘকালীন ঋণ বাজার (Long-term Loan Market) বলা হয়। ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান এই প্রকার ঋণ প্রদান করে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা, সরকার প্রধানত এই প্রকার ঋণ গ্রহণ করে।

5.5 তলবী টাকার বাজার

তলবী টাকার বাজার বলতে জাতীয় আর্থিক বাজারের সেই অংশকে বোঝায় যেখানে প্রধানত ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন উদ্বৃত্ত ফাণ্ড বা তহবিলের লেনদেন চলে। তলবী টাকার বাজারে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেওয়া-নেওয়া হয় এবং ঋণ পরিশোধের সময় একপক্ষ কাল অর্থাৎ একদিন থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

তলবী টাকার বাজারের ঋণ ঋণদাতা বা ঋণগ্রহীতার ইচ্ছানুযায়ী চাহিদামাত্র পরিশোধযোগ্য বলে এই ঋণ সহজেই নগদ অর্থ রূপান্তযোগ্য। অর্থাৎ তলবী টাকার তারল্যের মাত্রা খুব বেশী। নগদ অর্থের পরেই তলবী টাকার তারল্য বা তরলতা লক্ষ্য করা যায়, কারণ এই ঋণ চাহিদামাত্র পরিশোধযোগ্য।

5.5.1 তলবী টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য

তলবী টাকার বাজারের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

১. **অতি মাত্রায় তারল্য :** তলবী টাকার বাজারে ঋণের তারল্যের মাত্রা খুবই বেশি। নগদ টাকার পরেই তলবী ঋণের তরলতা থাকে। তলবী ঋণ স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য বলে এই ধরনের ঋণ অতি সহজেই দ্রুততার সঙ্গে নগদ টাকায় রূপান্তর করা যায়।

২. **তলবী হার :** তলবী টাকার বাজারে যে সুদের হার ধার্য করা হয় তাকে বলে তলবী হার বা কল

রেট। একটি দেশে তলবী হারের ওঠানামা নির্ভর করে সেই দেশের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতির উপর।

৩. **স্বল্প সময়সীমা :** তলবী টাকার বাজার অতি স্বল্পমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করে। এই ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে সাধারণত ১ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত।

৪. **প্রত্যক্ষ সদস্য :** তলবী টাকার বাজারের প্রত্যক্ষ সদস্য হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, প্রাইমারী ডিলার্স ইত্যাদি যারা তলবী টাকার বাজার থেকে ঋণ নেয় ও দেয়।

৫. **নিরাপদ ঋণ :** তলবী টাকার বাজারে ঋণ চাহিবামাত্র শোধ করতে হয় বলে এই ঋণ খুবই নিরাপদ। ব্যাঙ্কগুলি তলবী ঋণ দিতে পছন্দ করে, কারণ ঋণগ্রহীতার হয়ে বাট্টা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে ব্যাঙ্ককে তলবী ঋণ শোধ করে দেয়।

৬. **বিভিন্নতা বা পার্থক্য :** প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন দেশের তলবী টাকার বাজারের প্রকৃতি এবং লেনদেনের ধরনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

5.5.2 তলবী টাকার বাজারের সুবিধা

তলবী অর্থের বাজারের সুবিধাগুলি হল

১. **উদ্বৃত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঘাটতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ফান্ডের স্থানান্তকরণ :** তলবী টাকার বাজার LICI, UTI ইত্যাদির মত উদ্বৃত্ত আর্থিক একক থেকে টাকার বাজারের ঘাটতি এককে; যেমন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে স্বল্প-মেয়াদী ফান্ডের হস্তান্তকরণে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে তলবী টাকার বাজারে অর্থের বাজারে স্বল্পকালীন আর্থিক স্থায়িত্ব/স্থিরতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে আর্থিক বাজারের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় না।

২. **খুব কম সময়ের জন্য ঋণ পাওয়ার সুবিধা :** তলবী টাকার বাজারে খুব স্বল্প-মেয়াদী ঋণের, যেমন ১ দিন থেকে ১৫ দিনের ঋণের লেনদেন সম্পাদিত হয়। সুতরাং তলবী টাকার বাজার যে-সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান খুব স্বল্প-মেয়াদী ফান্ডের ঘাটতিতে ভোগে, তাদের আর্থিক ঋণ প্রদান করে ফান্ডের সাময়িক অভাব দূর করে।

৩. **অর্থের অস্থায়ী বা সাময়িক ঘাটতি পূরণ :** তলবী টাকার বাজার দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাঙ্কগুলোর অর্থের সাময়িক ঘাটতি পূরণ করে।

৪. **আন্তঃব্যাঙ্ক ঋণ :** তলবী টাকার বাজার খুব স্বল্প-মেয়াদী আন্তঃব্যাঙ্ক ঋণের লেনদেনে সাহায্য করে।

৫. **বিনিয়োগে সাহায্য :** তলবী টাকার বাজার শেয়ার বাজারের স্বল্প-মেয়াদী বিনিয়োগে এবং সরকারী লগ্নিপত্র, ট্রেজারি বিল ও অন্যান্য স্বল্প-মেয়াদী লাভজনক লগ্নিপত্রে অর্থ বিনিয়োগে সাহায্য করে।

৬. **স্বল্প-মেয়াদী ফান্ডের যোগান বৃদ্ধি :** তলবী টাকার বাজার অর্থের বাজারের স্বল্প-মেয়াদী ফান্ডের যোগান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

5.5.3 ভারতের তলবী টাকার বাজারের অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

১. স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া সহ অন্যান্য তফসিলী ব্যাঙ্ক সমূহ।

২. তফসিল বহির্ভূত ব্যাঙ্কসমূহ

৩. সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ

৪. বিদেশী ব্যাঙ্ক সমূহ

৫. ডিসকাউন্ট এণ্ড ফিনান্স হাউস অফ ইণ্ডিয়া

৬. সিকিউরিটিস এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

৭. জীবন বীমা নিগম

৮. সাধারণ বীমা নিগম

৯. ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

১০. প্রাইমারি ডিলার্স বা প্রধান প্রতিনিধি ইত্যাদি।

5.6 ট্রেজারী বিল বাজার

যে বাজারে সরকারি বিল বা প্রত্যর্থপত্রের (Promissory Note) ক্রয়বিক্রয় হয় তাকে বলে ট্রেজারি বিল বাজার (Treasury Bill Market)। প্রকৃতপক্ষে ট্রেজারি বিল হল এক ধরনের আর্থিক বিল বা প্রত্যর্থপত্র যা সরকার স্বীকৃত। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ভারতের রাজ্য সরকারগুলি কখনো-কখনো প্রয়োজনবোধে ট্রেজারি বিল বিক্রয় (Issued) করত। পরবর্তীকালে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই ট্রেজারি বিল বিক্রয় করার অধিকারী হয়। ট্রেজারি বিল হল সরকারের স্বল্পমেয়াদি দায়। স্বল্পকালীন আর্থিক ঘাটতি মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ ট্রেজারি বিল বিক্রয় করে থাকে।

5.6.1 ট্রেজারি বিলের বৈশিষ্ট্য (Features of Treasury Bill)

ট্রেজারি বিলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল, (১) ট্রেজারি বিলের তরলত্বের মাত্রা সাধারণ বিলের চেয়ে অনেক বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিলের জামিনদার। (২) ট্রেজারি বিলের অর্থ ফেরতের কোনো ঝুঁকি নেই বললেই চলে। ট্রেজারি বিল প্রকৃতপক্ষে সরকারি বিল। তাই কুঋণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। (৩) ট্রেজারি বিলের লেনদেনজনিত খরচ খুবই কম। (৪) এটি নিশ্চিত আয়যুক্ত। (৫) এতে সামান্য মূলধন অবচয় হয়। (৬) ট্রেজারি বিল পাওয়া যায় ন্যূনতম ২৫,০০০ টাকার এবং তার গুণিতক হারে। ভারতের ট্রেজারি বিল বাজার খুব বেশি উন্নত নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাড়া ভারতে ট্রেজারি বিল কেনার কোনো ক্রেতা নেই। তাও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এই বিল কিনতে অর্থাৎ পুনর্বাট্টা (Re-discounted) করতে বাধ্য।

5.6.2 ট্রেজারি বিলে বিনিয়োগের সুবিধা (Advantage of Investment in Treasury Bill)

ট্রেজারী বিলে বিনিয়োগের অনেক সুবিধা আছে। যেমন -

১. ট্রেজারী বিল হস্তান্তরযোগ্য দলিল।

২. ট্রেজারী বিল সরকারী বিল। তাই কু-ঋণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

৩. ট্রেজারী বিলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসমূল থেকে কর কাটা হয় না।

৪. ট্রেজারী বিলের সরলত্বের মাত্রা সাধারন বিলের চেয়ে অনেক বেশি।

৫. ট্রেজারী বিলের লেনদেন জনিত খরচ খুবই কম।

৬. স্বল্পমেয়াদী ট্রেজারী বিলের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ ফেরতের হার বেশ ভাল।

5.6.3 বিভিন্ন ধরনের ট্রেজারি বিল (Different Types of Treasury Bill)

৯১ দিনের ট্রেজারি বিল (91-Day Treasury Bill)

ট্রেজারি বিল বাজারকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ৯১ দিনের ট্রেজারি বিল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ৯১ দিনের ট্রেজারি বিল নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় শুরু হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিলামের দিন এবং নিলামের অধীন ট্রেজারি বিলের পরিমাণ ঘোষণা করে। সাধারণত সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে নিলামের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে টেন্ডার ডাকা হয় এবং যে টেন্ডারে সর্বনিম্ন অধিহারের উল্লেখ থাকত সেটিই সম্পূর্ণ গৃহীত হত। নিলাম পদ্ধতিতে বণ্টনযোগ্য ৯১ দিনের ট্রেজারি বিলের সুদের হার ট্যাপ পদ্ধতিতে বণ্টনযোগ্য বিলের তুলনায় বেশি। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চার হাজার কোটি টাকার ৯১ দিনের ট্রেজারি বিলকে দু-বছরের মেয়াদি তহবিলে হস্তান্তর করে এবং এই তহবিলে সুদের হার নির্দিষ্ট করে শতকরা ১২ টাকা। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ পর্যন্ত প্রতিটি নিলামের অর্থের পরিমাণ ছিল ৫০০ কোটি টাকা, কিন্তু ওই বছরের ২১ মার্চ থেকে নিলামের পরিমাণ কমিয়ে করা হয় ১০০ কোটি টাকা। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে নিলামের পরিমাণ বাড়িয়ে করা হয় ৫০০ কোটি টাকা। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে করা হয় ২,০০০ কোটি টাকা।

১৮২ দিনের ট্রেজারি বিল (182 Day Treasury Bill)

স্বল্পমেয়াদি টাকার বাজারকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে এবং সাময়িক উদ্‌ঘৃত্তকে বিনিয়োগের জন্য ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে টাকার বাজারে ১৮২ দিনের ট্রেজারি বিল নামে একটি নতুন লগ্নিপত্র চালু করা হয়। টাকার বাজারের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ছাড়াও এই বিলের বিপণনের পিছনে ভারত সরকারের উদ্দেশ্য ছিল বাজেট ব্যয় মেটানোর জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করা। এইদিক দিয়ে বিচার করলে ১৮২ দিনের ট্রেজারি বিলকে একটি নতুন ফিসক্যাল লগ্নিপত্র বলা যেতে পারে।

১৮২ দিনের ট্রেজারি বিলের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল , (১) শুরুতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৮২ দিনের ট্রেজারি বিল মাসিক নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করত। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর বিক্রয় করা শুরু হয়। (২) নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তহবিলের পরিমাণ আগে থেকে নির্দিষ্ট করা হত না। প্রতিটি নিলামের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিলের পরিমাণ নির্ভর করত নিলামে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলির হাতে মজুত বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত তহবিলের উপর। (৩) ভারতের আবাসিক যে-কোনো ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১৮২ দিনের ট্রেজারি বিল ক্রয় করতে পারে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ধরনের বিল মোটেই ক্রয় করতে পারত না।

১৮২ দিনের ট্রেজারি বিলের ফেরত লাভের হার ছিল খুব আকর্ষণীয় (Attractive Rate of Return)। তথাপি কতকগুলি বিশেষ কারণে কর্তৃপক্ষ ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে এই বিলের লেনদেন ধীরে ধীরে কমিয়ে দেয় এবং ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর এই বিলের লেনদেন একদম বন্ধ করে দেয়। সুতরাং এই বিলের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ছ-বছর। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে এই বিলের বকেয়া অর্থের পরিমাণ ছিল ৩,৯৮৬ কোটি টাকা। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ট্রেজারি বিল পুনরায় চালু করে। কিন্তু ২০০১ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত এই বিল বিক্রি করা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে এই বিল পুনরায় চালু করা হয়। ২০০৯-১০ খ্রিস্টাব্দে এই বিলের বকেয়া অর্থের পরিমাণ ২১,৫০০ কোটি টাকা।

৩৬৪ দিনের ট্রেজারি বিল (364-Day Treasury Bill)

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে টাকার বাজারে ৩৬৪ দিনের ট্রেজারি বিল ছাড়া হয়। আসলে ১৮২ দিনের ট্রেজারি বিলের লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের পরেই কর্তৃপক্ষ ৩৬৪ দিনের ট্রেজারি বিল বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই বিলের প্রথম নিলাম হয় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল। প্রথম থেকেই প্রতি ১৫ দিন অন্তর এই বিলের নিলাম হয়। এই বিলের বৈশিষ্ট্যগুলি ১৮২ দিনের ট্রেজারি বিলের মতোই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই বিল ক্রয় করতে পারে না এবং পুনর্বাট্টাও (Re-discount) করে না। এই বিল বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। এই বিলে ফেরতযোগ্য লাভের হারও ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এই বিলের বাজারের আয়তন যথেষ্ট বেড়ে যায়।

5.7 প্রত্যয়ন আমানত

প্রত্যয়ন আমানত হল হস্তান্তরযোগ্য স্বল্প সময়ের জন্য মেয়াদি জমা (Negotiable Short-term Deposit)। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে প্রত্যয়ন আমানত ব্যবস্থা চালু হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বাজারে চালু সুদের হারে এই আমানত গ্রহণ করে থাকে, তবে ব্যাঙ্কের সাধারণ জমার সঙ্গে এই প্রত্যয়ন আমানতের বেশকিছু পার্থক্য আছে। আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ছাড়া সমস্ত তপশিলভুক্ত ব্যাঙ্ক প্রত্যয়ন আমানতপত্র বিলি করতে পারে।

5.7.1 বিলিকারী সংস্থা (Issuer of Certificate of Deposit)

আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ছাড়া সমস্ত তপশিলভুক্ত ব্যাঙ্ক প্রত্যয়ন আমানত বিলি করতে পারে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বল্প মেয়াদি সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের প্রত্যয়ন আমানতপত্র বিলি করার অনুমতি দিয়েছে।

5.7.2 বিলির পরিমাণ (Size of Issue)

প্রত্যয়ন আমানতপত্র বিলির সর্বনিম্ন পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা। তারপর ১ লক্ষ টাকা গুণিতকে বিনিয়োগ করা যায়। সর্বোচ্চ পরিমাণ কোনো নির্দিষ্ট নয় । তপশিলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি সর্বোচ্চ যে-কোনো পরিমাণ প্রত্যয়ন আমানতপত্র বিলি করতে পারে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সর্বশেষ নিরীক্ষিত উদ্বর্ত পত্রে দেখানো নিজস্ব তহবিলের একশো শতাংশ প্রত্যয়ন আমানতপত্র বিলি করতে পারবে না।

5.7.3 মেয়াদপূর্তির সময়কাল (Maturity Period)

ব্যাঙ্কের বিলিকৃত প্রত্যয়ন আমানতপত্রের সর্বনিম্ন সময়কাল ৭ দিন, সর্বোচ্চ সময়কাল ১ বছর। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে প্রত্যয়ন আমানতপত্রের মেয়াদপূর্তির সময়সীমা ১ বছরের নীচে নয় এবং ৩ বছরের ঊর্ধ্বে নয়।

5.8 বাণিজ্যিক কাগজ

ভাগল কমিটি (Vaghul Committee)-র সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার বাজারে দুটি আর্থিক দলিলের (Financial Instruments) প্রবর্তন করে। এই আর্থিক দলিলগুলির মধ্যে একটি হল বাণিজ্যিক কাগজ (Commercial Paper)– অন্যটি হল প্রত্যয়ন আমানত (Certificate of Deposit)।

5.8.1 বাণিজ্যিক কাগজের সংজ্ঞা (Definition of Commercial Paper)

আর্থিক তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলি (Corporate Bodies) যে স্বল্পমেয়াদি প্রতিশ্রুতিপত্র বিনিয়োগকারীদের ব্যাঙ্কে বিলি করে তাকে বলে বাণিজ্যিক কাগজ (Commercial Paper)। বাণিজ্যিক কাগজ বিলির ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলিকে যে যে শর্ত পূরণ করতে হয়, সেগুলি হল (১) কোম্পানির স্পর্শযোগ্য নিট সম্পত্তির মূল্য ৪ কোটি টাকার কম হওয়া চলবে না। (২) প্রতিটি কোম্পানিকে যে-কোনো ব্যাঙ্কে বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকরী মূলধনের জন্য একটি নগদ ঋণ হিসাবখাত (Cash Credit Account) খুলতে হবে। (৩) কোম্পানিকে একটি অনুমোদিত ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থার কাছ থেকে মূল্যায়নের প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে হবে। এই প্রশংসাপত্রটি দু-মাসের বেশি পুরোনো হওয়া চলবে না।

5.8.2 বাণিজ্যিক কাগজের মেয়াদ (Maturity Period of Commercial Paper)

বাণিজ্যিক কাগজের মেয়াদপূর্তির সর্বনিম্ন সময় ছিল ১৫ দিন, সর্বোচ্চ সময় ১ বছর। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের

এপ্রিল মাস থেকে মেয়াদপূর্তির সর্বনিম্ন সময় করা হয়েছে ৭ দিন এবং সর্বোচ্চ সময় ১ বছর। বিধিবদ্ধ সংস্থার ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় বাণিজ্যিক কাগজের মেয়াদপূর্তির সময় ছিল সর্বনিম্ন ৩ মাস থেকে সর্বাধিক ৬ মাস পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমানে অন্যান্যদের মতো সর্বনিম্ন সময় ৭ দিন এবং সর্বোচ্চ সময় ১ বছর। বাণিজ্যিক কাগজের রেয়াতি দিন (Days of Grace) থাকে না। মেয়াদপূর্তির দিন ছুটি থাকলে পরের কাজের দিন (Working Day) মেয়াদপূর্তির দিন ধার্য হয়।

5.8.3 বিলিকৃত বাণিজ্যিক কাগজের পরিমাণ (Size of Issued Commercial Paper)

তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলি ৫ লক্ষ টাকার গুণিতকে বাণিজ্যিক কাগজ বিলি (Issue) করতে পারে, তবে কোনো একক বিনিয়োগকারীর সর্বনিম্ন বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম হওয়া চলবে না। বাণিজ্যিক কাগজ বিলির শর্তাবলি ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঠিক করে দেয়।

5.8.4 বাণিজ্যিক কাগজের বিনিয়োগকারী (Investors in Commercial Paper)

যে-কোনো ভারতীয় ব্যক্তি, কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মুখ্য ব্যবসায়ী (Primary Dealers), স্যাটেলাইট ডিলারগণ (Satellite Dealers) বাণিজ্যিক কাগজে বিনিয়োগ করতে পারেন। এমনকি অনাবাসী ভারতীয়রাও বাণিজ্যিক কাগজে বিনিয়োগ করতে পারেন। তবে অনাবাসী ভারতীয়দের অ-প্রত্যাগমনের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে হয়।

5.8.5 বাণিজ্যিক কাগজের সুবিধা (Advantages of Commercial Paper)

বিলিকারীর দিক থেকে সুবিধা (Advantages to Issuer)

১. স্বল্পমেয়াদি তহবিলের উৎস (Sources of Short Term Fund) ঃ বাণিজ্যিক কাগজ বিলি করে খুব সহজে স্বল্পমেয়াদি তহবিল সংগ্রহ করা যায়। বর্তমানে বাণিজ্যিক কাগজের মেয়াদপূর্তির সময়সীমা ৭ দিন থেকে ১ বছর পর্যন্ত।

২. স্বল্প সুদের হার (Low Interest Rate) ঃ বাণিজ্যিক কাগজের সুদের হার ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের হার অপেক্ষা কম, যার ফলে বিলিকারীদের সুদজনিত খরচ কম হয়।

৩. আইনের জটিলতা কম (Less Legal Formalities) ঃ বাণিজ্যিক কাগজ বিলি করার ক্ষেত্রে আইনের জটিলতা অনেক কম। যার জন্য বিলিকারীদের কাছে এই ব্যবস্থা খুবই জনপ্রিয়।

৪. বিলি খরচ কম (Low Issue Cost) ঃ বাণিজ্যিক কাগজ বিলি করার খরচ তুলনামুলকভাবে কম।

বিনিয়োগকারীদের দিক থেকে সুবিধা (Advantages to Investor)

১. উচ্চ লাভযুক্ত (Higher Yield) অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি লগ্নিপত্রের থেকে বাণিজ্যিক কাগজের ফেরতযোগ্য লাভ সাধারণত বেশি।

২. তারল্য (Liquidity) ঃ বাণিজ্যিক কাগজ হস্তান্তরযোগ্য হওয়ার জন্য বিনিয়োগকারী খুব সহজেই

নগদ অর্থে রূপান্তর করতে পারে।

৩. নমনীয়তা (Flexibility) ঃ বাণিজ্যিক কাগজে বিনিয়োগ স্বল্পমেয়াদি বলে বিনিয়োগকারীরা তাদের স্বল্প সঞ্চয় স্বল্প সময়ের জন্য খুব সহজেই বিনিয়োগ করতে পারে।

5.9 ভারতীয় টাকার বাজারের সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের পূর্ববর্তী অনুন্নত ও অসংহত টাকার বাজারের ত্রুটি দূর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আর্থিক নীতির সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে যেমন নরসিমহম কমিটি, চক্রবর্তী কমিটি, ভাগল কমিটি, ইত্যাদি।

ভারতীয় টাকার বাজারে সাম্প্রতিক কালে যে সমস্ত পরিবর্তন আনা হয়েছে সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

১. **আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারিকরণ :** স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০-এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায় সরকারি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে সরকারিএকচেটিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারিকরণের উপর জোর দেওয়া হয়।

২. **উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনঃগঠন :** সাম্প্রতিককালে কোম্পানির অর্থসংস্থানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের পরিবর্তে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমান সরকারি গ্যারান্টি ছাড়াই অর্থসংস্থানের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করছে এবং ভাসমান সুদের হার প্রবর্তন করছে।

৩. **নিয়ম-নীতির পরিবর্তন :** পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য আনার উদ্দেশ্যে চক্রবর্তী কমিটি ও ভাগল কমিটির সুপারিশ মেনে ভারতীয় অর্থের বাজারের কার্যকলাপের নিয়ম ও নীতির পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে অর্থের বাজার সম্প্রসারিত ও সরল হয়েছে।

৪. **উদারীকরণ :** ১৯৯১ সালের উত্তরকালীন পর্যায়ে ভারতীয় টাকার বাজারে উদারীকরণ নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। ফলে টাকার বাজারে দেশীয় ও বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ও সম্প্রসারণ ঘটেছে।

৫. **পরিকাঠামোগত পরিবর্তন :** চক্রবর্তী কমিটি ও ভাগল কমিটির সুপারিশ মেনে সম্প্রতি ভারতীয় টাকার বাজারের সাংগঠনিক ও পরিকাঠামোগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর ফলে অর্থের বাজারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

৬. **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পুনঃগঠন :** বর্তমানে সরকারি ক্ষেত্রের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সম্পত্তির শ্রেণীবিভাগ, ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা, মূলধনের পর্যাপ্ততা ইত্যাদি সম্পর্কে বিচক্ষণ নীতি প্রয়োগ করে হিসাব রক্ষা করছে। এছাড়া বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলি অলাভজনক ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দিতে পারবে, ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্তি ঘটাতে পারবে এবং ঋণদান ও সুদের হার সম্পর্কে নমনীয়তা বজায় রাখতে পারবে।

৭. **মিউচুয়াল ফান্ড :** বর্তমানে ভারতের টাকার বাজারে মিউচুয়াল ফান্ডের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মিউচুয়াল ফান্ডগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে প্রাতিষ্ঠানিক লগ্নিপত্রে বিনিয়োগ করে। ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে মিউচুয়াল ফান্ড প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পের অর্থসংস্থানে উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা নিয়ন্ত্রণ করে।

৮. **স্বীকৃতি দান প্রতিষ্ঠান বা স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান :** কমিশন বা দস্তুরির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিলের উপর স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ভারতে বিশেষজ্ঞ স্বীকৃতি দান প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। সেইজন্য ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিই স্বীকৃতি দান প্রতিষ্ঠানের কাজ করে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের বাণিজ্যিক বিল বাজারে স্বীকৃতি দান প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করার ফলে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিলগুলি স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়াও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিলগুলিকে স্বীকৃতি প্রদানের কাজও ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি করে থাকে।

৯. **ডিসকাউন্ট অ্যান্ড ফিনান্স হাউস অফ ইন্ডিয়া :** ভারতের টাকার বাজারের কাজকর্ম সক্রিয় ও গতিশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ডিসকাউন্ট অ্যান্ড ফিনান্স হাউস অফ্ ইন্ডিয়া নামে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে ভারতে এই ডিসকাউন্ট হাউস গঠন করা হয়। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই প্রতিষ্ঠান কাজ শুর করে। ভারতের টাকার বাজারে ডিসকাউন্ট অ্যান্ড ফিনান্স হাউস অফ্ ইন্ডিয়ার ভূমিকা বা গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্মের ক্ষেত্র ছিল তলবী টাকার বাজার, সরকারি বিল ও বাণিজ্যিক বিল। ১৯৯১ সালে ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণের পর ১৯৯২ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারি ঋণপত্রের কেনাবেচা শুরু করে। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠানটিকে মুখ্য ডিলার -এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সময় থেকে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক বাজার এবং গৌণ বাজারে সরকারি লগ্নিপত্রের কেনাবেচা করে।

5.10 অনুশীলনী

1. টাকার বাজারের সংজ্ঞা দিন। টাকার বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
2. ভারতীয় টাকার বাজারের গঠন ও কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করুন।
3. তলবী টাকার বাজার বলতে কি বোঝেন?
4. তলবী টাকার বাজারের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
5. ভারতে তলবী টাকার বাজারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের ধরনগুলি আলোচনা করুন।
6. ট্রেজারী বিলের সংজ্ঞা দিন। ট্রেজারী বিল বিনিয়োগের সুবিধা গুলি উল্লেখ করুন।
7. বিভিন্ন ধরনের ট্রেজারী বিল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
8. প্রত্যয়ন আমানতের উপর একটি টীকা লিখুন।
9. বাণিজ্যিক কাগজের সংজ্ঞা দিন। এর সুবিধা গুলি আলোচনা করুন।
10. ভারতীয় টাকার বাজারের সাম্পতিক গতি প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

একক-6 ◆ মূলধনের বাজার - I

গঠন

6.1 উদ্দেশ্য

6.2 প্রস্তাবনা

6.3 মূলধন বাজারের ধারণা

6.4 মূলধনের বাজারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

6.5 মূলধন বাজারের কার্যাবলী

6.6 মূলধন বাজারের শ্রেণীবিভাগ

6.7 প্রাথমিক বাজার বা নতুন বিলি বাজার - ধারনা, কার্যবলী ও ভূমিকা

6.8 গৌণ বাজার বা শেয়ার বাজার - ধারনা, কার্যবলী ও ভূমিকা

6.9 প্রাথমিক বাজার ও গৌণ বাজারের মধ্যে পার্থক্য

6.10 প্রাথমিক বাজারের মধ্যস্থাকারী

6.11 অনুশীলনী

6.1 উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পড়ার পর জানা যাবে—

- মূলধন বাজারের ধারণা ও প্রধান অংশগ্রহণকারীগণ
- মূলধনের বাজারের কার্যাবলী
- মূলধন বাজারের ধারণা ও তার শ্রেণী বিভাগ
- প্রাথমিক বাজার ও গৌণ বাজারের ধারণা, কার্যবলী ও ভূমিকা
- প্রাথমিক ও গৌণ বাজারের মধ্যে পার্থক্য
- প্রাথমিক বাজারের বিভিন্ন মধ্যস্থাকারী

6.2 প্রস্তাবনা

মূলধনের বাজার একটি সুসংগঠিত বাজার, যেটি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের সংস্থান করে থাকে। মূলধনের বাজার থেকে কারবার তার মূলধনের যোগান পেয়ে থাকে।

6.3 ধারণা

পি. লিভিংস্টন এর মতে, ''মূলধনের বাজারের কাজ হল মূলধনের উপর কর্তৃত্ব বজায় রেখে সর্বোচ্চ আয়ের গতিকে সচল রাখতে সহায়তা করা।'' এই বাজার উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ও জাতীয় লভ্যাংশ বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকরী।

এস.সি কুচাল এর মতে একগুচ্ছ প্রণালী নিয়ে মূলধনের বাজার গড়ে ওঠে। এটি হল সেই সমস্ত প্রণালীর সমষ্টি যার মাধ্যমে সমাজের সঞ্চয়কে শিল্প, বাণিজ্য ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে পৌঁছে দেয়।

6.4 মূলধন বাজারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

মূলধন বাজারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হল—

১. **বিনিয়োগ প্রতিনিধি এবং সমিতি (Investment Agencies and Societies) :** বিনিয়োগ প্রতিনিধি ও সমিতিগুলো হল : ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, ইউনিট ট্রাস্ট, ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী বা ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্ট, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বিল্ডিং সোসাইটিস্, প্রভিডেন্ট ফান্ড সোসাইটিস্ ইত্যাদি।

২. **বীমা কোম্পানী (Insurance Comapanies) :** বীমা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানগুলো হল : জীবন বীমা কর্পোরেশন (LIC) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (GIC) ইত্যাদি।

৩. **অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Financial Institutions) :** অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হল : বিশেষ আর্থিক সংস্থা এবং উন্নয়নমূলক ব্যাঙ্ক, যেমন— IFC, SFCs, IDBI, ICICI, NIDC ইত্যাদি।

৪. **শেয়ার বাজার/লগ্নিপত্রের বাজার (Stock Exchange/Securities Market) :** ভারতের শেয়ার বাজারগুলো হল BSE, NSE, CSE, Over-the-Counter-Exchange of India ইত্যাদি।

6.5 মূলধন বাজারের কার্যাবলী

১. **দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সংস্থান :** এই বাজার দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সংস্থান হয়।

২. **বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি :** অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ঋণ প্রদান না করে এই বাজার শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে। যেমন— শেয়ার বাজার।

৩. **ট্রাস্টের মাধ্যমে বিনিয়োগ :** লগ্নিকারক ট্রাস্ট ও ইউনিট ট্রাস্ট জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নির্বাচিত লগ্নিপত্রে তা বিনিয়োগ করে।

৪. **মূলধন সরবারহ :** মূলধন সরবরাহ করা মূলধন বাজারের প্রধান কাজ। এই মূলধন সাধারণত স্থায়ী মূলধন হিসেবে কারবারে নিয়োজিত হয়।

৫. **ঋণের সুযোগগ্রহণকারী পক্ষ :** বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারী সংস্থা এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই বাজার ঋণ প্রদান করে।

৬. **সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ :** কারবার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্যও এই বাজার দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করে।

৭. **পরামর্শদান :** অনেক ক্ষেত্রে লগ্নিকারক সংস্থা (Investment Corporation) ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত পরামর্শ দেয়। মূলধন বাজারের বিভিন্ন সংস্থা, যেমন— আই.এফ. সি. আই. (IFCI), আই.ডি.বি.আই. (IDBI) আই.সি. আই. সি. আই. (ICICI), ইউনিট ট্রাস্ট ইত্যাদি বিভিন্ন কারবারী প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ও কারিগরি কৌশল-সংক্রান্ত পরমর্শ দিয়ে থাকে।

৮. **দায়গ্রহণ :** এই বাজার বিভিন্ন কোম্পানী ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের লগ্নিপত্র বিক্রয়ের দায়গ্রাহক হিসাবে কাজ করে।

6.6 মূলধন বাজারের শ্রেণীবিভাগ

যে বাজারে বিভিন্ন ধরনের লগ্নিপত্রের কেনা বেচা হয় অর্থাৎ লগ্নিপত্রের মালিকানার হস্তান্তর ঘটে সেই বাজারকে লগ্নিপত্রের বাজার বলে।

অধ্যাপক ওয়াই কে ভূষণ এর মতে লগ্নিপত্রের বাজার হল একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বাজার যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতারা লগ্নিপত্রের কেনাবেচা করে এবং যে বাজার বিভিন্ন প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠান কোম্পানির লগ্নিপত্রের বিক্রি ও পুনবিক্রিতে সাহায্য করে।

অধ্যাপক এল এম. ভোলের মতে শেয়ার বাজার বিভিন্ন মেয়াদের কর্পোরেটের লগ্নিপত্রের মূখ্য নির্ধারক বেঞ্চমার্ক হিসাবে কাজ করে।

লগ্নিপত্রের বাজারকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. প্রাথমিক বাজার বা নতুন বিলি বাজার

২. শেয়ার বাজার বা গৌণ বাজার

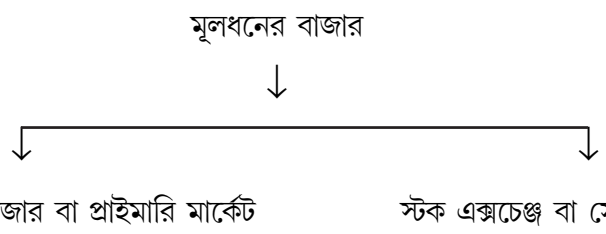

6.7 প্রাথমিক বাজার বা নতুন বিলি বাজার

যে বাজারে নতুন লগ্নিপত্র অর্থাৎ নতুন শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চলে সেই বাজারকে নতুন বিলি বাজার বা প্রাথমিক বাজার বলে।

এই বাজারে নতুন লগ্নিপত্র বিলিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন লগ্নিপত্র বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে এবং বিনিয়োগকারীরা এই সমস্ত লগ্নিপত্র ক্রয় করে মূলধনের বাজারে বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করে। এই কারণেই প্রাথমিক বাজার বা নতুন বিলি বাজারকে মুখ্য বাজার বলা হয়।

প্রাথমিক বাজার বা নতুন বিলি বাজারের কার্যাবলী ও ভূমিকা ঃ

প্রাথমিক বাজারের প্রধান কার্যাবলীগুলি আলোচনা করা হল :

১. **বিনিয়োগকারীদের সাহায্য :** প্রাথমিক বাজার লগ্নিকারকদের সঞ্চয় লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করে দেয়। এই বাজারের সক্রিয়তার ফলে ইচ্ছুক লগ্নিকারকরা তাদের সঞ্চিত অর্থ বিভিন্ন লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ পায়।

২. **উপদেশ প্রধান :** প্রাথমিক বাজার নতুন লগ্নিপত্র বিক্রি সংক্রান্ত নানা-ধরনের পরিষেবা উপদেশ আকারে প্রদান করে থাকে। উপদেশগুলির মধ্যে থাকে আইনগত বিষয়, শেয়ার বাজারের পরিস্থিতির ভিত্তিতে লগ্নিপত্রের মূল্য, বিলির সময়, বিলি করার পদ্ধতি ইত্যাদি।

৩. **দায়গ্রাহক বা অবলেখকের কাজ :** প্রাথমিক বাজার নতুন লগ্নিপত্রের ক্ষেত্রে যে দায়গ্রাহক বা অবলেখকের প্রয়োজন হয় সেই বিষয়ে সাহায্য করে। প্রাথমিক বাজারে যে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান নতুন লগ্নিপত্রের বিক্রি সম্পর্কে দায়গ্রহণ বা অবলেখনের কাজ করে তাকে বলে দায়গ্রাহক।

৪. **সম্পদের হস্তান্তর :** প্রাথমিক বাজারের প্রধান কাজ হল সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে উদ্যোক্তাদের কাছে সঞ্চয় বা সম্পদের হস্তান্তর করা। উদ্যোক্তারা এই সম্পদ ব্যবহার করে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে বা পুরানো প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ করতে পারে। সুতরাং এই বাজার সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে এবং সম্পদের ব্যবহার উৎপাদনমুখী করে তোলে।

৫. **রূপান্তরকরণের কাজ :** প্রাথমিক বাজার একমালিকানা প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে পাবলিক কোম্পানিতে রূপান্তরের সুযোগ সৃষ্টি করে। কারণ এই বাজার জনগণের কাছে শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি করে।

৬. **নতুন উদ্যোক্তাদের সাহায্য :** প্রাথমিক বাজার নতুন উদ্যোক্তাদের নতুন লগ্নিপত্র বিলি ও বণ্টনের ব্যবস্থা করে সাহায্য করে থাকে। এই সমস্ত উদ্যোক্তাদের সঙ্গে লগ্নিকারকদের পরিচয় না থাকায় মূলধন সংগ্রহের যে সমস্যা থাকে প্রাথমিক বাজার সেটি দূর করে এই সমস্ত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে সাহায্য করে।

৭. **প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজ :** প্রাথমিক বাজার সূচনায় কোনো কোম্পানির নতুন প্রস্তাব তদন্তের সময় প্রস্তাবটি প্রযুক্তিগত দিক, অর্থনৈতিক দিক, আইনগত দিক ইত্যাদি অনুসন্ধান করে নতুন প্রস্তাবের বাজার সম্ভাবনা কতটা তা বিচার করে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে।

৮. **অতিরিক্ত তহবিলের যোগান :** যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত তহবিলের প্রয়োজন, প্রাথমিক বাজার সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের শেয়ার ও ঋণপত্র বিলি ও বিক্রির মাধ্যমে অতিরিক্ত তহবিলের যোগান দেয়।

6.8 গৌন বাজার বা শেয়ার বাজার

যে বাজারে কোম্পানীর পুরানো লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয় হয় সেই বাজারকে বলে শেয়ার বাজার বা গৌণ বাজার। সুতরাং যে সুসংগঠিত বাজারে পুরানো লগ্নিপত্র অর্থাৎ পূর্বে যে সব লগ্নিপত্র বিলি করা হয়েছিল এবং যে সব লগ্নিপত্র স্টক মার্কেট-এ ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত সেই সমস্ত লগ্নিপত্রের ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে বলে শেয়ার বাজার বা গৌণ বাজার বলে।

শেয়ার বাজারের কার্যাবলী ও ভূমিকা :

শেয়ার বাজারে পুরানো লগ্নিপত্রের কেনাবেচা হয়। এই বাজারের প্রধান কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. **মূলধনের সংস্থান :** শেয়ার বাজারে শেয়ার বা ঋণপত্র খুব সহজে ক্রয়বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে। যার ফলে যৌথ মূলধনি কোম্পানিগুলি শেয়ার বাজারের মাধ্যমে খুব সহজেই মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। শেয়ার দায়গ্রাহকদের অনেকেই এরূপ বাজারের সভ্য। যার ফলে নতুন যৌথ কোম্পানিগুলিও এদের সহযোগিতায় শেয়ার বিক্রয় করে মূলধনের সংস্থান করে।

২. **বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা প্রদান :** শেয়ার বাজার কঠোর আইনকানুনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ এখানে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। এই জাতীয় বাজার না-থাকলে সরল বিনিয়োগকারীদের লগ্নিপত্রের চতুর দালালদের হাতে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। সুতরাং, বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োজিত অর্থের নিরাপত্তা দেওয়াও শেয়ার বাজারের কাজ।

৩. **মূলধনের প্রবাহকে বজায় রাখা :** শেয়ার বাজার মূলধনের প্রবাহকে সঠিক পথে প্রবাহিত করে। সাধারণত বিনিয়োগকারীরা মুনাফাজনক প্রতিষ্ঠানেই বিনিয়োগ করতে উৎসাহ বোধ করে। যখন বিনিয়োজিত প্রতিষ্ঠানে মুনাফা অর্জনের হার কমে যায় তখন তারা সেই শেয়ার বিক্রয় করে দেয় এবং অধিকতর লাভজনক প্রতিষ্ঠানে সেই অর্থ পুনরায় লগ্নি করে। এইভাবেই শেয়ার বাজারের মাধ্যমে জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ অধিক মুনাফাজনক প্রতিষ্ঠানে প্রবাহিত হয়।

৪. **লগ্নিপত্রের চলতি বাজার সৃষ্টি :** শেয়ার বাজার হল প্রচলিত লগ্নিপত্রের বাজার। এই বাজারেযে-কোনো

সময়ে লগ্নিপত্রকে নগদ অর্থে এবং নগদ অর্থকে শেয়ার বা লগ্নিপত্রে রূপান্তরিত করা যায়। এর ফলে লগ্নিপত্রের সহজ বিপণন সম্ভব হয়। সেইজন্য শেয়ার বাজারকে তৈরি বাজার বা চলতি বাজার ও বলা হয়। শেয়ার বাজার লগ্নিপত্রের চলতি বাজার সৃষ্টি করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ইচ্ছাপূরণে সাহায্য করে।

৫. **সাধারণ মানুষের সঞ্চয়স্পৃহা বৃদ্ধি :** বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত শেয়ারের বা ঋণপত্রের দর লক্ষ করলে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। সাধারণ মানুষ এই অবস্থা পর্যালোচনা করে নিশ্চিতভাবে তাদের স্বল্প সঞ্চয় বিনিয়োগ করতে পারে। সুতরাং, শেয়ারবাজার সাধারণ মানুষের সঞ্চয়স্পৃহাকে বৃদ্ধি করে। এর ফলে দেশের সাধারণ স্তর থেকে শিল্পের ক্ষেত্রে মূলধন প্রবাহিত হতে থাকে।

৬. **লগ্নিপত্রের মূল্যায়ন :** শেয়ার বাজার শেয়ার বিপণনের সুবিধা থাকায় শেয়ার অতি সহজে ক্রয়বিক্রয় করা সম্ভবপর হয়। এ. কে. সুর বলেছেন, ''লগ্নিপত্রের এই হস্তান্তরযোগ্যতা অর্থহীন হয়ে যেত যদি সম্ভাব্য ক্রেতাবিক্রেতাদের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে খোলা বাজারে মূলনিরূপণের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকত।'' সেই কারণে শেয়ার বাজারে দরকষাকষির বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। এই সকল দরকে বাজারমূল্য বলা হয়। এই সকল বাজারমূল্যের ভিত্তিতে শেয়ারের ধারকগণ যে-কোনো সময়ে তাদের শেয়ারের মূল্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে। সুতরাং, শেয়ার বাজার লগ্নিপত্রের মূল্যায়নে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে।

৭. **আয়ের পথ সুগম করা :** শেয়ার বা ঋণপত্র জামিন রেখে ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সবসময় ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকে। এইভাবে ঋণের ব্যবস্থা করে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের আয়ের পথ সুগম করে। শেয়ার বাজার না-থাকলে এটি সম্ভব হত না।

৮. **নগদ টাকায় রূপান্তর :** শেয়ার বাজারের মাধ্যমে খুব সহজেই শেয়ার বা ঋণপত্র যে কোনো সময় বিক্রয় করে নগদ টাকায় রূপান্তর করা যায়। তা ছাড়া লগ্নিপত্র বন্ধক রেখেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে-কোনো সময় ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং, নগদ টাকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে শেয়ার বাজারের বিশেষ এক অবদান লক্ষ্য করা যায়।

6.9 প্রাথমিক বা নতুন বিলি বাজার ও শেয়ার বাজারের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	নতুন বিলি বাজার	শেয়ার বাজার
(১) সংজ্ঞা	যে বাজারে নতুনভাবে শেয়ার এবং ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়, তাকে নতুন বিলি বাজার বলা হয়। অর্থাৎ এটি হল নতুন লগ্নিপত্র ক্রয়বিক্রয়ের বাজার।	লগ্নিপত্র ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেন ব্যাবসার কাজে সাহায্য, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে যে সকল নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত সমিতি, সংগঠন বা ব্যক্তিগোষ্ঠী স্থাপিত হয়, তাকে শেয়ার বাজার বলে। এককথায় বলা যায়, শেয়ার বাজার এমন একটি বাজার যেখানে দেরি না-করে ন্যায্য মূল্যে শেয়ার হস্তান্তর করা যায়।
(২) লগ্নিপত্রের প্রকৃতি	নতুন বিলি বাজার নতুন লগ্নিপত্রের ব্যাবসা করে। অর্থাৎ, যে সমস্ত লগ্নিপত্র পূর্বে বিক্রয় হয়নি, এই প্রথম লগ্নিকারকদের কাছে বিলি করা হবে, সেগুলিই এই বাজার থেকে বিক্রি হয়।	শেয়ার বাজার কখনও নতুন শেয়ার বা লগ্নিপত্র কেনাবেচা করে না। সর্বদা পূর্বে বিলি করা চালু লগ্নিপত্র এই বাজারের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়।
(৩) লগ্নি সৃষ্টি	নতুন বিলি বাজার লগ্নি সৃষ্টি করে।	শেয়ার বাজার লগ্নিকে জীবনীশক্তি দেয়।
(৪) প্রয়োজনীয়তা	মূলধন সৃষ্টিও বৃদ্ধির জন্য নতুন বিলি বাজারের প্রয়োজন।	সৃষ্ট মূলধনকে অব্যাহত রাখতে শেয়ার বাজারের প্রয়োজন।
(৫) নিয়ন্ত্রণ	নতুন বিলি বাজার তার ব্যাবসার পরিপূর্ণতার জন্য কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা প্রশাসনের অধীন নয়।	সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুনের বিধি ও উপবিধি অনুসারে শেয়ার বাজারের কাজকর্ম পরিচালিত হয়।
(৬) অবস্থান	নতুন বিলি বাজার কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নয়। অর্থাৎ, এই বাজারের কোনো ভৌগোলিক অস্তিত্ব নেই।	শেয়ার বাজার সাধারণত দেশের বিভিন্ন বড়ো বড়ো শহরে বা শিল্পকেন্দ্রের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হয়।
(৭) নিজস্ব ভবন	নতুন বিলি বাজারের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য নিজস্ব কোনো ভবন নেই। যে কোম্পানি নতুন শেয়ার বিলি করে সেই কোম্পানির প্রধান কার্যালয় থেকেই শেয়ার বিলির কাজকর্ম পরিচালিত হয়।	শেয়ার বাজারের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য নিজস্ব ভবন রয়েছে। সদস্যরা সেখান থেকেই কাজকর্ম পরিচালনা করেন। শেয়ার বাজারের সদস্য ভিন্ন কেউ এই ভবনে প্রবেশ করতে পারেন না।
(৮) অর্থের পরিমাণ	নতুন বিলি বাজারের লগ্নিকৃত অর্থের সমগ্র পরিমাণ দেশের শেয়ার বাজারে লগ্নিকৃত মোট অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা কম।	শেয়ার বাজারে লগ্নিকৃত সমগ্র অর্থের পরিমাণ নতুন বিলি বাজারের লগ্নিকৃত মোট অর্থের থেকে বেশি।

6.10 প্রাথমিক বাজারের মধ্যস্থাকারী

ক্যাপিটাল ইস্যুস (নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৪৭ এর বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত অব্যাহতি আদেশ এবং বিধিগুলির অধীনে নতুন ইস্যু বাজার/কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী মূলধন ইস্যু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। ১৯৯২ সালে আইনটি বাতিল করা এবং সিসিআই এর কার্যালয় বিলুপ্তির ফলে, সিকিউরিটিজ মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং বাজার/ ক্রিয়াকলাপের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রনের প্রচার SEBI-এর দায়িত্ব হয়ে ওঠে। দেশে নতুন সমস্যাগুলির ক্রিয়াকলাপকে সুরক্ষিত করার জন্য, এটি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। সুতরাং, আমরা এখানে আলোচনা করব, বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীদের সম্পর্কে।

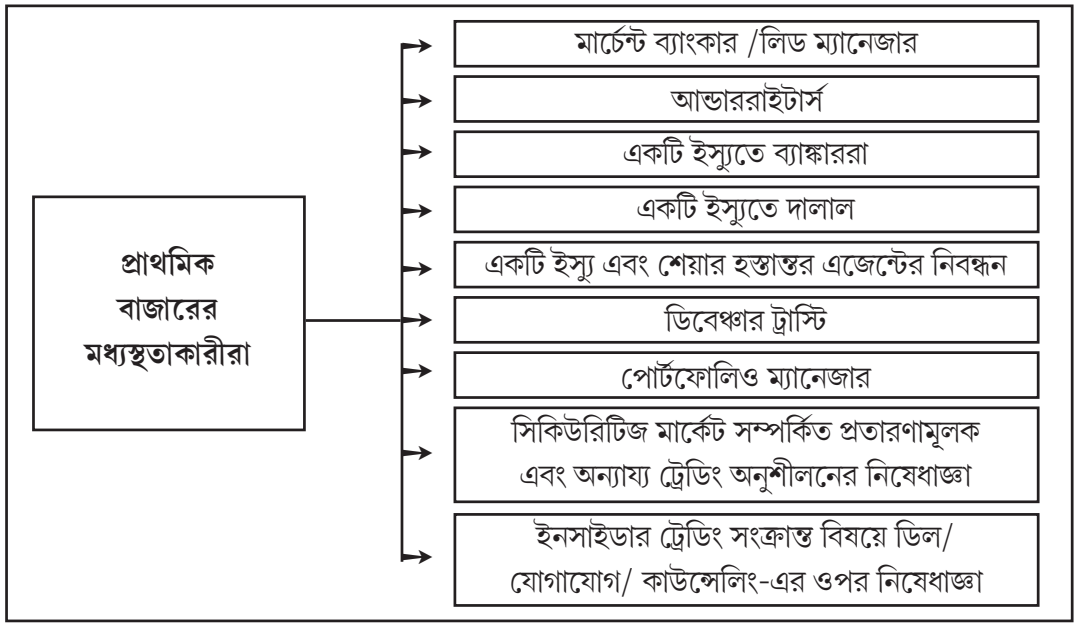

মার্চেন্ট ব্যাংকার /লিড ম্যানেজার ঃ আধুনিক সময়ে, মার্চেন্ট ব্যাংকারের গুরুত্ব আনেক বেশি, কারন এটি কোম্পানি এবং মূলধন ইস্যু করার মধ্যে প্রধান মধ্যস্থতাকারী। মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারদের প্রধান কর্মকাণ্ড হল- মূলধন কাঠামোর গঠন নির্ধারণ, প্রসপেক্টাস এবং আবেদনপত্রের খসড়া তৈরি, পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা, শেয়ারের আবেদন এবং স্থানান্তরের মোকাবেলা করার জন্য নিবন্ধক নিয়োগ, ইসুতে ব্যাংকার, প্রচার এবং বিজ্ঞাপনী এজেন্ট, প্রিন্টার এবং আর আনেক কিছু।

আন্ডাররাইটার্সঃ নতুন ইস্যু/ প্রাথমিক বাজারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারী হল মূলধন ইস্যু করার জন্য আন্ডাররাইটাররা যারা সম্পূর্ণভাবে সাবস্ক্রাইব করা হয়নি এমন সিকিউরিটিজ নিতে সম্মত হন। তারা অন্যদের দ্বারা বা নিজের দ্বারা ইস্যুটি সাবস্ক্রাইব করার প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসের পরে আন্ডাররাইটিং বাধ্যতামুলক নয়, তবে এর সংগঠন প্রাথমিক বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

একটি ইস্যুতে ব্যাংকাররা ঃ একটি ইস্যুতে ব্যাংকাররা বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে আবেদনের অর্থের সাথে মূলধন এবং আবেদনের অর্থ ফেরত দেওয়ার মত কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকে।

একটি ইস্যুতে দালাল ঃ দালালরা মূলত সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ইস্যুতে সাবস্ক্রিপশন সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। দালাল নিয়োগ বাধ্যতামুলক নয় এবং সংস্থাগুলি যে কোনও সংখ্যক দালাল নিয়োগ করতে স্বাধিন।

একটি ইস্যু এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্টের নিবন্ধন ঃ প্রাথমিক বাজারে একটি মধ্যস্থতাকারী হিসাবে একটি ইস্যুতে নিবন্ধকগণ, বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে আবেদন সংগ্রহ করা, বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আবেদন এবং অর্থের যথাযথ রেকর্ড রাখা বা অর্থ প্রদানের মতো কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ডিবেঞ্চার ট্রাস্টি ঃ একটি ডিবেঞ্চার ট্রাস্টি হল একটি কোম্পানির ডিবেঞ্চারের যেকোনো সমস্যা সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি ট্রাস্ট ডিডের ট্রাস্টি। ডিবেঞ্চার ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করার জন্য, SEBI থেকে একটি শংসাপত্র প্রয়োজন।

পোর্টফোলিও ম্যানেজার ঃ পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে এমন এক ব্যক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যারা ক্লায়েন্টদের সাথে একটি চুক্তি অনুসরন করে, তাদের পক্ষ থেকে সিকিউরিটিজ / ক্লায়েন্টদের তহবিলের পোর্টফোলিও পরিচালনা / প্রশাসনের পরামর্শ দেয়, নির্দেশ দেয়।

6.11 অনুশীলনী

1. মূলধন বাজারে কার্যাবলী আলোচনা করুন।
2. মূলধন বাজরের অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্টান সমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
3. নতুন বিলি বাজারের কার্যাবলী আলোচনা করুন।
4. প্রাথমিক ও গৌন বাজারের মধ্যের পার্থক্য গুলি উল্ল্যেখ করুন।
5. প্রাথমিক বাজারের মধ্যস্থাকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

একক - 7 ◆ মূলধনের বাজার - II

গঠন

7.1 উদ্দেশ্য

7.2 প্রস্তাবনা

7.3 শেয়ার বাজারের কার্যানির্বাহী

7.3.1 দালাল

7.3.2 উপদালাল

7.3.3 প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী

7.3.4 অনাবাসিক ভারতীয়

7.4 সিকিউরিটিস এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইণ্ডিয়া (সেবি)

7.4.1 সেবির কার্যাবলী

7.4.2 সেবির ভূমিকা

7.5 অনুশীলনী

7.1 উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পড়ার পর জানা যাবে—

- শেয়ার বাজার কিভাবে পরিচালিত হয়
- শেয়ার বাজারে দালাল, উপদালাল, প্রতিষ্টানিক বিনিয়োগকারীদের ভূমিকা
- মূলধন বাজার নিয়ন্ত্রনে সেবির কার্যবলী ও ভূমিকা

7.2 প্রস্তাবনা

শেয়ার বাজার পরিচালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যর্নিবাহীর ভূমিকা অপরীসীম, সঠিক ও সুষ্টভাবে শেয়ার বাজারের কার্যকলাপ চালানোর জন্য সঠিক নিয়ন্ত্রন একান্ত কাম্য।

7.3 শেয়ার বাজারের কার্যনির্বাহী

যারা শেয়ার বাজারের কার্যাবলী সম্পাদন করে তাদেরকে শেয়ার বাজারের কার্যনির্বাহী বলা হয়। শেয়ার বাজারের সদস্যরাই কেবলমাত্র শেয়ার বাজারের লেনদেন-এর কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই শেয়ার

বাজারের নিবন্ধিত সদস্যরাই শেয়ার বাজারের কার্যনির্বাহী।

শেয়ার বাজারের বিভিন্ন প্রকার কার্যনির্বাহী থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১. দালাল
২. উপ-দালাল
৩. মুখ্য কারবারী
৪. পোর্টফোলিও পরামর্শদাতা
৫. প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী
৬. অনাবাসিক ভারতীয়

নিম্নে শেয়ার বাজারের কার্যনির্বাহীদের সম্পর্কে আলোচনা কর হল।

7.3.1 দালাল

বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজারে সরাসরি বিনিয়োগ করতে পারে না। এখানে সমস্ত ধরনের বিনিয়োগ মধ্যস্থাকারীদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই মধ্যস্থাকারীরাই হল দালাল।

অর্থাৎ শেয়ার বাজারের যে সকল অনুমোদিত ব্যক্তি শেয়ার বাজারের নির্দিষ্ট আচরণ বিধি পালন করে মক্কেলের হয়ে নির্দিষ্ট দস্তুরির বিনিময়ে লগ্নিপত্র কেনাবেচা করে তাদের দালাল বলে।

বর্তমানে ভারতের শেয়ার বাজারে দালাল হিসাবে কাজ করতে হলে সিকিউরিটিস এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইণ্ডিয়ার কাছে থেকে নিবন্ধন এর প্রমানপত্র গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

দালালের কার্যাবলী

দালালের প্রধান প্রধান কাজগুলো হল—

১. **সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সাহায্য :** দালাল শেয়ার বাজারে লগ্নিপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সাহায্য করে। যেহেতু সাধারণ বিনিয়োগকারী শেয়ার বাজারে প্রত্যক্ষভাবে লগ্নিপত্র কেনা-বেচা করার যোগ্য নয়, এই কারণে লগ্নিপত্রের কেনা-বেচায় সাধারণ বিনিয়োগকারীদের দালালের সাহায্য অত্যাবশ্যক।

২. **যোগাযোগকারী :** লন্ডন শেয়ার বাজারে দালাল জনসাধারণ ও মুখ্য কারবারীর যোগাযোগাকারী হিসেবে এবং ভারতের শেয়ার বাজারে দালাল মুখ্য কার্যনির্বাহী বা লগ্নিপত্রের স্বাধীন ডিলার হিসেবে কাজ করে। উপ-দালালদের মাধ্যমে দালাল লগ্নিপত্রের লেনদেনে বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

৩. **লগ্নিপত্রের লেনদেন :** শেয়ার বাজারের যারা সদস্য নয় তাদের পক্ষে দালাল শেয়ার বাজারে লগ্নিপত্রের লেনদেন সম্পাদন করে এবং প্রতিদান হিসেবে দালালী বা দস্তুরি পায়।

৪. **বিভিন্ন ধরনের লগ্নিপত্রের কেনা-বেচা :** দালালকে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন

মক্কেলদের হয়ে কাজ করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের মক্কেলদের প্রকৃতি, আচরণ ও পছন্দের হেরফের অনুযায়ী দালালকে বিভিন্ন প্রকার লগ্নিপত্রের কেনা-বেচা করতে হয়।

৫. **প্রতিনিধিত্বের কাজ :** শেয়ার বাজারে দালালরা বিনিয়োগকারীদের দক্ষ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে থাকে।

7.3.2 উপদালাল

শেয়ার বাজারে যে ব্যক্তি কোন দালালের অধীনে থেকে দালালের প্রতিনিধি হিসাবে বিনিয়োগকারীকে লগ্নিপত্র কেনা বেচার কাজে বা লেননদেনের কাজে এবং দালালদের অন্যান্য কাজে সাহায্য করে তাদের উপ-দালাল বলে। উপ-দালাল শেয়ার বাজারের সদস্য নয়। একজন উপ-দালাল এক সাথে একাধিক দালালের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে পারে।

উপ-দালালের কার্যাবলী

উপদালালের যে সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে তা নিম্নরূপ :

১. **বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদান :** উপ-দালাল লগ্নিপত্র ক্রয়কারীকে ক্রয়-সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদনের মাধ্যমে এবং সত্বর লগ্নিপত্রের ডেলিভারি বা হস্তান্তরকরণের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে। অনুরূপভাবে উপ-দালাল লগ্নিপত্রের বিক্রয়কারীকে তার লগ্নিপত্র সর্বোচ্চ দামে বিক্রি করে দিয়ে তাকে সত্বর অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে।

২. **প্রতিনিধিত্বের কাজ :** উপ-দালাল তার দালালদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে এবং দালালদের কাজের মাত্রা বা পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করে। উপ-দালাল দালাল বা দালালদের পক্ষে মক্কেল জোগাড় করে এবং লগ্নিপত্রের লেনদেন সম্পাদনে দালাল বা দালালদের সাহায্য করে।

৩. **লেনদেন সম্পাদন :** উপ-দালাল লগ্নিপত্রের ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষে দালালের মাধ্যমে লেনদেন সম্পাদন করে।

৪. **সংযোগকারী :** উপ-দালাল বিনিয়োগকারী এবং দালালের মধ্যে সংযোগকারী বা মধ্যস্থ কারবারী হিসেবে কাজ করে।

৫. **কার্যনির্বাহী :** উপ-দালাল শেয়ার বাজারের একজন গুরুত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহী। সে শেয়ার বাজারের কাজের মাত্রা বা পরিমাণ বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকে এবং শেয়ার বাজারের কার্যাবলী সম্পাদনে দালালদের সাহায্য করে। উপ-দালালের কার্যাবলী শেয়ার বাজারকে সক্রিয় রাখে।

7.3.3 প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী

যে-সব প্রতিষ্ঠান শেয়ার বাজারের লগ্নিপত্রে বিপুল পরিমাণ লগ্নি বা বিলগ্নি করে, সেইসব প্রতিষ্ঠানকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বলে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা খুব বড় বড় বিনিয়োগকারী এবং তারা একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ লগ্নিপত্র ক্রয় বা বিক্রয় করতে সক্ষম।

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ভূমিকা :

জীবন বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, ইউনিট ট্রাস্ট, বিল্ডিং সোসাইটিস্, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি ভারতের প্রখ্যাত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী। এরা প্রত্যেকেই শেয়ার বাজারের দালাল, উপ-দালাল, পোর্টফোলিও পরামর্শদাতা ইত্যাদিদের মাধ্যমে শেয়ার বাজারের লগ্নিপত্র একসঙ্গে বিপুল পরিমাণে ক্রয় বা বিক্রয় করে।

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কার্যাবলী :

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের প্রধান প্রধান কাজগুলি হল—

১. **সঞ্চয়ের পুঞ্জিকরণ :** জনগণের কাছে লগ্নিপত্র বিক্রয় করে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা সমাজের সঞ্চয়কে একত্রিত করে এবং সংগৃহীত অর্থ লাভজনক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়ে বিনিয়োগ করে।

২. **দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দান :** প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দেয়।

৩. **উপদেশমূলক কাজ :** প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ-সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। এরা বিভিন্ন শিল্পের কোম্পানীকে উপদেশ দেয়।

৪. **শেয়ার ও লগ্নিপত্র ক্রয় :** প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা নানা শিল্পের কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করে এবং শিল্পজাত কোম্পানীর দীর্ঘ মেয়াদী স্থির মূলধন গড়ে তোলে।

৫. **দায়গ্রহণ/অবলেখন :** প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বিলিকারী কোম্পানীর শেয়ার অবলেখন করে।

৬. **বিনিয়োগের নিরাপত্তা :** প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা করে ও লগ্নিপত্রে বিনিয়োগের নিরাপত্তা দিয়ে তাকে।

7.3.4 অনাবাসিক ভারতীয়

যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক চাকরি সূত্রে, ব্যবসা সূত্রে, পেশাগত কারণে অথবা অন্য যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ভারতের বাইরে অর্থাৎ বিদেশে বসবাস করে তাদের বলা হয় অনাবাসিক ভারতীয়। অনাবাসিক ভারতীয়রা যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারেন তা হল :

(১) কোম্পানী বিনিয়োগ (২) মিউচুয়াল ফাণ্ডে বিনিয়োগ (৩) একমালিকী ও অংশীদারী কারবারে বিনিয়োগ

অনাবাসিক ভারতীয়দের বিনিয়োগ নির্দেশিকা :

অনাবাসিক ভারতীয়দের ভারতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলি আছে। যেমন— ১) পুনঃপ্রেরণের ভিত্তিতে বিনিয়োগ এবং ২) অ-পুনঃপ্রেরণের ভিত্তিতে বিনিয়োগ।

পুনঃপ্রেরণের ভিত্তিতে বিনিয়োগ

১. পুনঃপ্রেরণের ভিত্তিতে অনাবাসিক ভারতীয়রা ভারতে যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে সম্পূর্ণ (১০০%) সুবিধা পাবে সেগুলি হল— (ক) উচ্চ অগ্রাধিকারযুক্ত শিল্পে; (খ) রুগ্‌ণ শিল্পে; (গ) ১০০% রপ্তানিযুক্ত শিল্প, বৈদ্যুতিন শিল্প, সফটওয়্যার শিল্প, হার্ডওয়্যার শিল্প প্রভৃতিতে এবং (ঘ) গৃহনির্মাণ ও স্থাবর সম্পত্তি উন্নয়ন ক্ষেত্রে।

২. পুনঃপ্রেরণের ভিত্তিতে অনাবাসিক ভারতীয়রা ভারতে যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে ৮০% সুবিধা পাবে সেগুলি হল— (ক) বেসরকারি ব্যাঙ্কিং পরিসেবার ক্ষেত্রে এবং (খ) উৎপাদন ক্ষেত্রের কোনো কোম্পানি শেয়ার বা রূপান্তরযোগ্য ডিবেঞ্চারে নতুন বিলির ক্ষেত্রে।

৩. পুনঃপ্রেরণের ভিত্তিতে অনাবাসিক ভারতীয়রা ভারতে যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে ৪০% সুবিধা পাবে সেগুলি হল— (ক) হাসপাতাল, (খ) হোটেল, (গ) জাহাজে মাল আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে এবং (ঘ) তৈল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে।

অ-পুনঃপ্রেরণের ভিত্তিতে বিনিয়োগ

অ-পুনঃপ্রেরণের ভিত্তিতে অনাবাসিক ভারতীয়রা যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে, সেগুলি হল— (১) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ অ-রূপান্তরযোগ্য ডিবেঞ্চারে, (২) বাণিজ্যিক পত্রে এবং (৩) টাকার বাজারের মিউচ্যুয়াল ফাণ্ডে।

7.4 সিকিউরিটিস এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইণ্ডিয়া (সেবি)

১৯৮৮ সালে প্যাটেল কমিটির সুপারিশ মেনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিস্ এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং যুক্তরাজ্যের সিকিউরিটিস্ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট বোর্ডের অনুরূপ সিকিউরিটিস্ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ্ ইন্ডিয়া বা সেবি গঠিত হয়। শুরুতে সেবি একটি প্রশাসনিক সংস্থা হিসেবে কাজ করতে থাকে। কিন্তু ১৯৯২ সালে ভারতীয় সংসদে সেবি আইন পাশ হয়।

সেবি-র পরিচালক পর্ষদে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিযুক্ত দু'জন সদস্য ও একজন চেয়ারম্যান বা সভাপতি, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ ও কোম্পানী আইন-প্রশাসন মন্ত্রকের দ্বারা মনোনীত দুজন সদস্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা মনোনীত একজন সদস্য এবং বাকি পাঁচজন অন্যান্য সদস্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত তিনজন সর্বক্ষণের সদস্য আছে।

7.4.1 সেবির কার্যাবলী :

শেয়ার বাজারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সেবি-র অবদান ও ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেবি-র প্রধান প্রধান কার্যাবলী নিচে আলোচনা করা হল—

১. **নথিবদ্ধ সংক্রান্ত কাজ :** শেয়ার বাজারের সঙ্গে যুক্ত শেয়ার দালাল, সহদালাল, এজেন্ট ও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করাও সেবির অন্যতম কাজ। শেয়ার দালাল বা মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং হিসাবে

কাজ করতে হলে সেবির কাছে নাম নথিবদ্ধ করতে হয়। শুধু তাই নয়, সেবি শেয়ার দালাল ও মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিংয়ের আচরণবিধি ও নিয়মনীতিও নির্দিষ্ট করে দেয়।

২. **নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলী :** সেবি শেয়ার বাজার ও লগ্নিপত্রের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। যে-সববিনিয়োগকারী একসঙ্গে প্রচুর লগ্নিপত্র কেনা-বেচা করে এবং কোম্পানী অধিগ্রহণের প্রচেষ্টা করে সেবি তাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে এবং সতর্ক পর্যবেক্ষক বা অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে। শেয়ার বাজারের অবৈধ ফাট্‌কা কারবার এবং অনৈতিক কাজকর্ম প্রতিরোধ করার জন্য সেবি সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৩. **নিরাপত্তার কাজ :** বিভিন্ন নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সেবি বিনিয়োগকারীদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষায় ব্রতী হয়। বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে সেবি বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার ব্যবস্থা করে।

৪. **মিউচ্যুয়াল ফান্ডের কাজ নিয়ন্ত্রণ :** মিউচ্যুয়াল ফান্ডসহ বিভিন্ন ফান্ডের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করাও সেবির অন্যতম প্রধান কাজ।

৫. **নিষেধমূলক কার্যকলাপ :** সম্ভবত সেবি-র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শেয়ার বাজারের তছরুপ, কারচুপি, প্রতারণা ইত্যাদি অসৎ ও অনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করা। সেবি অগ্রিম ব্যবসা, লগ্নিপত্রের অন্তর্ভুক্তি ব্যবসা, অসৎ লেনদেনকারীদের দামের কারচুপি ও অত্যধিক ফাট্‌কা বা জুয়ার প্রতিরোধে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৬. **পর্যবেক্ষক হিসাবে কাজ :** যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত পরিমাণে অন্য কোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে বা একটি কোম্পানি অন্য কোনো কোম্পানিকে অধিগ্রহণ করে, তাহলে সেবি সেখানে সতর্কতামূল পর্যবেক্ষক হিসাবে কাজ করে।

৭. **অভিযোগ প্রতিকার-সংক্রান্ত কাজ :** শেয়ার বাজারের লেনদেন-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিনিয়োগকারীদের যে-সব অভিযোগ থাকে, সেবি সেগুলোর প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শেয়ার দালাল, উপ-দালাল, পোর্টফোলিও পরামর্শদাতা, বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, লগ্নিপত্রের তত্ত্বাবধায়ক, গচ্ছিতকারীদের যে কোন অভিযোগ সেবি প্রতিকার করে থাকে।

৮. **গবেষণা সংক্রান্ত কাজ :** লগ্নি বাজারের গবেষণা সংক্রান্ত কাজ বা কাজে সাহায্য করাও সেবির কাজের মধ্যে পড়ে। অনেক সময় সেবি বিভিন্ন তথ্য ও গবেষণামূলক পত্রিকাও প্রকাশ করে।

7.4.2 সেবির ভূমিকা : বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারতীয় শেয়ার বাজারে সেবির ভূমিকা অপরিসীম। নিচে সেবির প্রধান ভূমিকাগুলি আলোচনা করা হল :

১. **শেয়ার বিলির ক্ষেত্রে ভূমিকা :** বর্তমান শেয়ার বাজারে শেয়ার বিলির ক্ষেত্রে দেখাশোনার সম্পূর্ণ অধিকার সেবির আছে। বিশেষত নতুন শেয়ার বিলির ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলিকে অবশ্যই সেবির

কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিতে হয়। সেবির অনুমতি ছাড়া কোনো কোম্পানি নতুন শেয়ার বিলি করলে তা বেআইনি বলে গণ্য হবে।

রাইট শেয়ার বিলির ক্ষেত্রেও কোম্পানিগুলিকে সেবির কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হয়। বিলিকৃত শেয়ারের সঙ্গে কোন্ অনুপাতে রাইট শেয়ার বাজারে ছাড়া হবে সেবি তাও নির্ধারণ করে দেয়।

২. **শেয়ার বাজারের কার্যাবলীর উপর তদারকি সম্পর্কে সেবি-র ভূমিকা :** সেবি ভারতের সব শেয়ার বাজারগুলোর কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ নজরদারী করে। যে শেয়ার বাজারে অবৈধ কার্যকলাপ হয়, সেবি তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে এবং তার কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে ব্যাখ্যা দাবি করতে পারে। প্রয়োজনে সেবি তার কাজ অনাধিক ৭ দিন পর্যন্ত বন্ধ করতে পারে অথবা কোনো বিশেষ লগ্নিপত্রের লেনদেন বন্ধ করতে পারে।

৩. **অবৈধ ফাট্‌কা লেনদেন প্রতিরোধ সম্পর্কে সেবি-র ভূমিকা :** সেবি-র অন্যতম কাজ হল শেয়ারের উপর অবৈধ ফাট্‌কা লেনদেন বন্ধ করা। সঠিক সময়ে অত্যধিক ফাট্‌কা কারবার বন্ধ না করলে শেয়ার বাজার জুয়াখেলার আড্ডায় পরিণত হতে পারে। অবৈধ ফাট্‌কা বন্ধ করার জন্য সেবি শেয়ার দালাল, উপদালাল, ক্ষমতাপ্রাপ্ত করণিক, রেমিসিয়ার্স ইত্যাদিদের কার্যকলাপের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. **শেয়ারের উপর জুয়াখেলা প্রতিরোধ সম্পর্কে সেবি-র ভূমিকা :** শেয়ার কেলেঙ্কারী প্রতিরোধের জন্য সেবি শেয়ারের উপর জুয়াখেলা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। হর্ষদ মেহেতা ও কেতন পারেখের শেয়ার কেলেঙ্কারীর পর সেবি এই বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকছে।

৫. **শেয়ার দালালদের কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সেবি-র ভূমিকা :** সেবি শেয়ার বাজারের সদস্যদের কার্যাবলীর ওপর কড়া নজরদারী করে। সেবি যদি দেখে যে, কোনো শেয়ার দালাল শেয়ার বাজারকে জুয়ার আড্ডায় পরিণত করার চেষ্টা করছে, তবে সেবি তার কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ করতে পারে অথবা তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। সেবি শেয়ার বাজারের কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে এবং কৈফিয়ৎ দাবি করতে পারে। দেশের সব শেয়ার বাজারগুলোর কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করা সেবি-র দায়িত্ব।

৬. **বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা :** শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীর বিভিন্নভাবে প্রতারিত হন। কখনও শেয়ার দালালদের কাছে, কখনও বা কোম্পানির কাছে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত একাধিক কোম্পানির নামে বিনিয়োগকারীদের প্রভূত পরিমাণে নালিশ জমে আছে। বর্তমানে সেবি শেয়ার বাজারকে সম্পূর্ণভাবে কঠোর নিয়মনীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করে। যার ফলে বিনিয়োগকারীদের অভিযোগের সংখ্যা দিন দিন কমছে। ১৯৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে যেখানে সারা ভারতে অভিযোগেরসংখ্যা ছিল ৫,১৬,০৮০টি, সেখানে ২০০৮-০৯ খ্রিস্টাব্দে অভিযোগের সংখ্যা ৫৭,৫৮০টি। পূর্ববর্তী

বছরে নিষ্পত্তি হয়নি এমন কিছু অভিযোগসহ সেবি সংশোধন করে দিয়েছে ৭৫,৯৮৯টি। বর্তমানে সেবির কর্তৃত্বে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ অনেকটাই সুরক্ষিত।

৭. **মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা :** বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিংয়ের দায়িত্বও কর্তব্য অপরিসীম। মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং হিসাবে কাজ করতে হলে সেবির কাছে নাম নথিবদ্ধ করতে হয় এবং সেবির নির্দেশিত নির্দিষ্ট আচরণবিধি মেনে চলতে হয়। সেবির নির্দেশিত নীতি মার্চেন্ট ব্যাঙ্কাররা মেনে না-চললে সেবি তাদের নিবন্ধন বাতিল করে দিতে পারে অথবা নিবন্ধন সাময়িকভাবে স্থগিত বা ঝুলিয়ে রাখতে পারে।

৮. **ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলির ক্ষেত্রে ভূমিকা :** রেটিং সাধারণত ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীক চিহ্নের দারা লগ্নিপত্রের গুণগতমান সুনির্দিষ্ট করে। তাই বর্তমানে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্রেডিট রেটিং ব্যবসা করার জন্য রেটিং এজেন্সিগুলিকে সেবির কাছে নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলিকে সেবির নির্দেশিত আচরণবিধি মেনে চলতে হয়। যদি রেটিং এজেন্সিগুলি সেইসব আচরণবিধি মেনে না-চলে তাহলে সেবি তাদের নিবন্ধন বাতিল করে দেয়।

7.5 অনুশীলনী

1. শেয়ার বাজারের কার্যানির্বাহী হিসাবে দালালের ভূমিকা আলোচনা করুন।
2. প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বলতে কি বোঝেন? প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
3. শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক হিসাবে সেবির ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।
4. সেবির কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

একক - 8 ◆ আর্থিক পরিষেবা

গঠন

8.1 উদ্দেশ্য

8.2 ধারণা

8.3 আর্থিক পরিষেবার শ্রেণীবিভাগ

8.4 আর্থিক পরিষেবার বৈশিষ্ট্য

8.5 মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং

8.5.1 মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এর কার্যাবলী

8.5.2 মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এর ভূমিকা

8.5.3 মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত সেবির নির্দেশাবলী

8.6 ক্রেডিট রেটিং বা ঋণ মান নির্ণয়

8.6.1 ধারণা

8.6.2 ক্রেডিট রেটিং এর বৈশিষ্ট্য

8.6.3 ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

8.6.4 ক্রেডিট রেটিং এর সীমাবদ্ধতা

8.6.5 ভারতীয় ক্রেডিট রেটিং সংস্থাগুলির বিবরণ।

8.7 সারাংশ

8.8 অনুশীলনী

8.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে—

- আর্থিক পরিষেবার ধারণা
- আর্থিক পরিষেবার বৈশিষ্ট্য
- মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এর বিভিন্ন কার্যাবলী ও ভূমিকা
- মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত সেবীর নির্দেশাবলী

- ক্রেডিট রেটিং সংস্থার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলী ও সীমাবদ্ধতা
- ভারতের প্রধান ক্রেডিট রেটিং সংস্থাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

8.2 ধারণা

আর্থিক পরিষেবা বলতে বোঝার একটি মাধ্যম যার সাহায্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি, অর্থের বাজার ও অর্থ সংক্রান্ত দলিল গুলি, ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীকে প্রয়োজনীয় সেবাকার্য সম্পন্ন করে। আর্থিক পরিষেবা সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং আর্থিক ব্যবস্থার গতিশীলতা সুনিশ্চিত করে।

8.3 আর্থিক পরিষেবার শ্রেণীবিভাগ

আর্থিক পরিষেবা দু ধরনের হতে পারে। একটি (ক) ফাণ্ড ভিত্তিক বা সম্পদ ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা ও অন্যটি (খ) ফি ভিত্তিক বা উপদেশ ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা

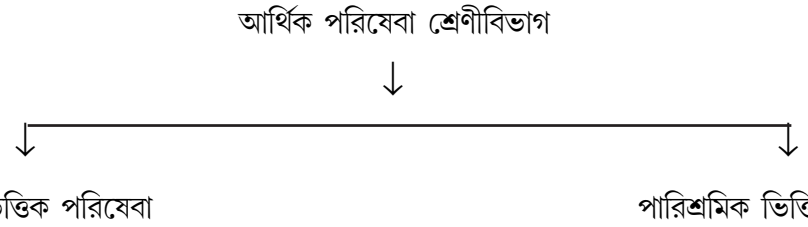

ফাণ্ড ভিত্তিক বা সম্পদ ভিত্তিক পরিষেবা

সম্পদ ভিত্তিক পরিষেবা বলতে সেই ধরনের পরিষেবা বোঝায় যার মাধ্যমে বাণিজ্য-সংস্থা কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করা হয়।

উদাহরণ স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা, হুণ্ডি ভাঙ্গানো, দেনাদারের দায়িত্ব নেওয়া, ঋণ বাট্টা, উদ্যোগ মূলধন সরবরাহ দায়গ্রহণ ইত্যাদি।

পারিশ্রমিক ভিত্তিক পরিষেবা

পারিশ্রমিক ভিত্তিক পরিষেবা বলতে বোঝায় সেইসমস্ত মধ্যস্থাকারী প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা যারা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ক্রেতা বা মক্কেলদের অর্থ সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করে।

উদাহরণ— বিলি ব্যবস্থাপনা, পোর্টফোলিও পরামর্শদাতা, মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং, অধিগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি, মূলধন পুনর্গঠন ইত্যাদি।

8.4 আর্থিক পরিষেবার বৈশিষ্ট্য

আর্থিক পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

১. **ক্রেতা-কেন্দ্রিক :** আর্থিক পরিষেবা ক্রেতা-কেন্দ্রিক। এই ধরনের পরিষেবা যারা দেয় তারা এই পরিষেবার গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী কৌশল নির্ধারণ করে যাতে ব্যয় কম হয় এবং লগ্নীপত্র নগদে রূপান্তর সহজ হয়। এই ধরনের পরিষেবা দাতারা সব সময় অর্থের বাজারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ রাখে এবং তারা উদ্ভাবনের মাধ্যমে বাজারে নতুন নতুন আর্থিক পরিষেবার সৃষ্টি করে যাতে ভবিষ্যতে তা ক্রেতার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং আইনগত কোন সমস্যার সৃষ্টি না করে। বর্তমানে বিশ্বায়নের কথা বিবেচনা করে একদিকে সর্বগ্রাহ্য পণ্য তৈরী করে আবার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক পরিষেবা সৃষ্টি করতেও সাবলীল থাকে। তবে সব সময়ই এই ধরনের পরিষেবার উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় হয় যে সব প্রতিষ্ঠান তাদের আর্থিক পরিষেবার ক্রেতা তারা কিভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সুবিধা পেতে পারে তার উপর।

২. **অস্পর্শনীয় :** আর্থিক পরিষেবা স্বাভাবিকভাবেই অস্পর্শনীয় প্রকৃতির। প্রকৃতপক্ষে যে সব প্রতিষ্ঠান পরিষেবা দেয় তারা যদি তাদের মক্কেলের কাছে নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা সৃষ্টি করতে না পারে এবং তাদের আস্থা অর্জন করতে না পারে তবে তারা সফল নাও হতে পারে। সুতরাং মক্কেলের আস্থা অর্জন করার জন্য তাদের প্রয়োজন সেবার গুণগতমানের উন্নত করা এবং আর্থিক পরিষেবার নতুন ধরন উদ্ভাবনের মাধ্যমে ক্রেতার কাছে বিশ্বাস অর্জন করা।

৩. **অবিচ্ছেদ্যতা :** আর্থিক পরিষেবার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সেবা উৎপাদন ও সেবা সরবরাহ একই সঙ্গে সম্পাদন করা। এইজন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আর্থিক পরিষেবা দেয় তাদের সঙ্গে তাদের মক্কেলের সুন্দর বোঝাপড়া থাকা প্রয়োজন।

৪. **নশ্বরতা বা সংরক্ষণের অযোগ্যতা :** শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য যেমন সংরক্ষণ করে রাখা যায় বা গুদামজাতকরন করা সম্ভব হয়, আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। ক্রেতা যখন যেমন চাইবে সেই অনুযায়ী তাকে সময়মত সেবা পরিবেশন করতে হবে। এই জন্য চাহিদার দিকে নজর রেখে আর্থিক পরিষেবার যোগানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **মানুষ কেন্দ্রিক সেবা :** এই পরিষেবা প্রধানত মানুষের দ্বারা মানুষের সেবা। যথাযথ প্রক্রিয়া আরোপ করে দায়িত্বশীল দক্ষ কর্মীদের সাহায্যে উন্নত গুণগত মানের সেবা প্রদান করে থাকে, আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি।

৬. **উদ্ভাবনামূলক :** আর্থিক পরিষেবার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এটি উদ্ভাবনমূলক। আর্থিক পরিষেবা প্রতিষ্ঠানগুলি সব সময় আর্থিক বাজারের প্রয়োজন অনুসন্ধান করে এবং চাহিদা অনুসারে উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন নতুন আর্থিক পরিষেবা সৃষ্টি করে।

8.5 মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং

যে সমস্ত আর্থিক সংস্থা অর্থ সংগ্রহ, বাণিজ্যিক উদ্যোগ, ব্যাঙ্কিং বিনিয়োগ, অধিগ্রহণ ও অন্যান্য বিষয়ে উপযুক্ত পরিশ্রমিকের বিনিময়ে পরামর্শ ও উপদেশ দেয় এবং অর্থের সওদা করে সেই সমস্ত আর্থিক সংস্থাকে সওদাগরী ব্যাঙ্ক বা মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক বলে।

ভারতের লগ্নিপত্র ও বিনিময় পর্ষদ (সেবি) এর মতে, মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এমন এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানির লগ্নি বা বিলি ব্যবস্থাপনায় যুক্ত থাকে এবং ব্যবস্থাপক, পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা হিসাবে লগ্নিপত্র কেনা বেচার প্রতিশ্রুতি দেয় বা বিলি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে।

8.5.1 মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের কার্যাবলী

সমস্ত আর্থিক সংস্থা অর্থ সংগ্রহ, বাণিজ্যিক উদ্যোগ, ব্যাঙ্কিং, বিনিয়োগ, অধিগ্রহণ ও অন্যান্য বিষয়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরামর্শ ও উপদেশ দেয় এবং অর্থের সওদা বা বাণিজ্য করে সেই সমস্ত আর্থিক সংস্থাকে বলে সওদাগরী ব্যাঙ্ক বা মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক।

সওদাগরী ব্যাঙ্ক বা মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যাবলী হল :

১. **উপদেষ্টামূলক কাজ :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক মক্কেলদের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপদেষ্টামূলক পরিষেবা প্রদান করে। মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক তার মক্কেলদের আর্থিক উপদেশ, বিনিয়োগ উপদেশ এবং কর্পোরেট উপদেশ দিয়ে থাকে। মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক পেশাগত দক্ষতা প্রয়োগ করে মক্কেল বা গ্রাহকদের দ্রুত ও কম ব্যয়ে কাজ সম্পাদনের বিষয়ে যথাযথ উপদেশ দেয়।

২. **বিলিকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক প্রাথমিক বাজারে বিলিকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ করে। বিলিকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ হিসাবে মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক নতুন শেয়ার বিলির ক্ষেত্রে শেয়ারের আবেদনপত্র গ্রহণ, আবণ্টন, অর্থ সংগ্রহ, সার্টিফিকেট পাঠানো, অতিরিক্ত আবেদনপত্রের অর্থ ফেরৎ দেওয়া, ডিভিডেন্ট ও সুদ প্রদান, বিবরণপত্র তৈরি, শেয়ারের দাম নির্ধারণ, ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

৩. **দায়গ্রহণের কাজ :** লগ্নিপত্রের দায়গ্রহণ মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ তহবিল ভিত্তিক কাজ। এই ব্যাঙ্ক মক্কেলদের কোম্পানির লগ্নিপত্র বিক্রির দায়িত্ব গ্রহণ করে। মার্চেন্ট ব্যাঙ্কগুলি বাজারে পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করলেও বৃহৎ বিলির ক্ষেত্রে কয়েকটি মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক দলবদ্ধভাবে একটি সিন্ডিকেট বা সংঘ গঠন করে যৌথ উদ্যোগে দায়গ্রাহকের কাজ করে। ফলে পৃথক পৃথক সংস্থা হিসাবে মার্চেন্ট ব্যাঙ্কগুলির ঝুঁকির পরিমাণ কমে।

৪. **মূলধন বাজারের কাজ :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক মূলধন বাজারের কার্যাবলীর কেন্দ্রে অবস্থান করে। এর কার্যকলাপ মূলধন বাজারের কার্যাবলীর উন্নতি ঘটায়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানগুলি মূলধন বাজারে একগুচ্ছ আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে ও তহবিলের যোগান দেয়। প্রকৃত অর্থে এই ব্যাঙ্ক শিল্প ও

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থায় মধ্যস্থতা করে।

৫. **পেশাদারী সেবা :** অভিজ্ঞ, দক্ষ, পরাদর্শী এবং বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ থাকায় পেশাদারী কর্মীদের সাহায্যে মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক উচ্চমানের পেশাদারী সেবা দিয়ে থাকে। যেমন এই ব্যাঙ্ক শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বন্ড ইত্যাদি লগ্নিপত্রের বিলিকারীদের পেশাদারী সেবা প্রদান করে।

৬. **প্রকল্প সম্পর্কিত কার্যাবলী :** প্রকল্পের মূল্যায়ন করা মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রকল্পের আর্থিক, কারিগরি ও বাণিজ্যিক দিক খতিয়ে দেখে মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক মক্কেলদের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। অনেক ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক প্রকল্পের বিশদ প্রতিবেদনের জন্য পরামর্শদাতা নির্বাচন করে। প্রকল্পের কি ধরনের ঋণের প্রয়োজন, কোথা থেকে ঋণ নেওয়া হবে, ঋণদানকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, সরকারি দপ্তর থেকে অনুমতি সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাজও মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক করে থাকে।

৭. **বৈদেশিক যোগাযোগ :** বর্তমানে মার্চেন্ট ব্যাংকিংয়ের কার্যপদ্ধতি দেশের সীমারেখা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রবেশ করেছে। অনাবাসী ভারতীয় ফান্ড, ইউরো ইস্যু ও গ্লোবাল লোন প্রভৃতি বিষয়গুলি যুক্ত হওয়ায় মার্চেন্ট ব্যাংকিংয়ের কার্যপরিধির বিস্তার ঘটেছে।

৮. **বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করা :** আজকাল অধিকাংশ মার্চেন্ট ব্যাংকিং সংস্থার বাজার গবেষণা বিভাগ আছে। যার ফলে এই সংস্থাগুলি খুব ভালোভাবেই বিভিন্ন বিনিয়োগের ঝুঁকি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এই সমস্ত বিনিয়োগ সংক্রান্ত ঝুঁকির খবর এই সংস্থাগুলি বিনিয়োগকারীদের জানিয়ে দেয়।

৯. **কোম্পানি গঠনে সাহায্য :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের একটি অন্যতম কাজ হল কোম্পানি গঠনে সাহায্য করা। কোম্পানি গঠনে মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক যে সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করে সেগুলি হল কোম্পানির পরিমেল বন্ধের খসড়া তৈরি, কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলীর খসড়া তৈরি, কোম্পানি নিবন্ধনে আইনগত সাহায্য ইত্যাদি।

১০. **মক্কেলদের ঋণের ব্যবস্থা করা :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল মক্কেলদের ঋণের ব্যবস্থা করা। এই কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য ঋণ প্রকল্প তেরী করা, ঋণ প্রদানকারী সংস্থা নির্বাচন করে তাদের সাথে ঋণ গ্রহণের শর্তাবলী আলোচনা ঋণ পেতে সাহায্য করে।

8.5.2 মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের ভূমিকা

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সওদাগরী ব্যাঙ্কিং এর গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হবার পর থেকে সওদাগরী ব্যাংকারদের কাজের পরিধি ক্রমশ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে সওদাগরী ব্যাংকারদের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. **দায়গ্রাহকের ভূমিকা :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং-এর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল দায়গ্রাহকের ভূমিকা। মার্চেন্ট ব্যাঙ্কাররা অগ্রণী ব্যবস্থাপক ও দায়গ্রাহকের ভূমিকায় কাজ করে। এরা লগ্নিপত্রের বিক্রি ও

বণ্টনে গ্যারান্টি দেয়। বড় বড় ইস্যু বা বিলির ক্ষেত্রে দায়গ্রহণের কাজ একাধিক মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার যৌথভাবে পালন করে। তারা একটি নিষদ সংঘ বা সিন্ডিকেট গঠন করে বড় ইস্যু বা বিলির দায়গ্রহণ করে এবং ইস্যুর ঝুঁকি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। যৌথ উদ্যোগে ঝুঁকি বহনের এই প্রথা দায়গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

২. **অগ্রণী ব্যবস্থাপকের ভূমিকা :** কোম্পানীর বিলি ব্যবস্থাপনায় অগ্রণী ব্যবস্থাপকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোম্পানীর বিবরণপত্র পরীক্ষা করা থেকে শুরু করে বিলি ব্যবস্থাপনা কাজ সম্পূর্ণ করা পর্যন্ত সর্বস্তরে অগ্রণী ব্যবস্থাপকের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। অগ্রণী ব্যবস্থাপক বিবরণপত্র পরীক্ষা করে। বিবরণীপত্রের চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করে, বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করে, অতিরিক্ত আবেদন পত্রের টাকা ফেরত দেবার ব্যবস্থা করে ইত্যাদি। কোম্পানী এক বা একাধিক অগ্রণী ব্যবস্থাপক নিয়োগ করতে পারে। বিলির পরিমাণের উপর নির্ভর করে অগ্রণী ব্যবস্থাপকের সংখ্যা ঠিক করা হয়। সওদাগরী ব্যাঙ্কাররা অগ্রণী ব্যবস্থাপকের ভূমিকা ছাড়াও ব্যবস্থাপক ও পরামর্শ দাতার ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩. **মধ্যবর্তীর ভূমিকা :** ব্যবস্থাকারী হিসাবে মার্চেন্ট ব্যাঙ্কাররা মধ্যবর্তীর ভূমিকা পালন করে। মক্কেলদের পক্ষে তারা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে এবং ঋণগ্রহীতাদের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। মধ্যবর্তী হিসেবে তারা বিলিকৃত লগ্নিপত্রগুলোকে বিনিয়োগকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এদের বাজারে সুনাম ও মর্যাদা থাকে বলে এরা সহজেই বিনিয়োগকারীদের প্রভাবিত করতে পারে। অনুরূপভাবে ঋণগ্রহীতারাও এদের কার্যকারিতায় আস্থা রাখে। এই কারণে বিনিয়োগকারী ও ফান্ডের ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে এদের কাজ করতে সুবিধে হয়।

৪. **পরিষেবার ভূমিকা :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্কাররা পারদর্শী, অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ সেবাপ্রদানকারীর ভূমিকায় কাজ করে। এরা ঋণগ্রহীতা ও বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা প্রদান করে। বিশেষজ্ঞ সেবা প্রধানকারী সংস্থা হিসেবে তারা কি ধরনের লগ্নিপত্র, কখন এবং কি শর্তে বিলি করতে হবে তার নির্দেশ দেয়। এরা ঋণের ঝুঁকি নেয় এবং লগ্নিপত্র কেনার গ্যারান্টি দেয়। তাছাড়া মার্চেন্ট ব্যাঙ্কাররা প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, বিপণন-সংক্রান্ত পরিষেবা, বাণিজ্যিক কাগজপত্রের লেনদেন ইত্যাদি কাজও করে।

৫. **বিলি ব্যবস্থাপনার ব্যাংকার হিসাবে সওদাগরী ব্যাংকারদের ভূমিকা :** ১৯৯২ সালের সেবি আইন অনুযায়ী ১৪.৭.১৯৯৪ ভারত সরকার বিলি ব্যবস্থাপনার ব্যাঙ্কার নিয়োগ সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছিল সেবি সংস্থার সার্টিফিকেট ব্যতীত কোনো ব্যাঙ্ক বিলি ব্যবস্থাপনার হতে পারবে না এবং শুধুমাত্র তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কই বিলি ব্যবস্থাপনার ব্যাঙ্কার হতে পারবে।

৬. **পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকের ভূমিকা :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং মক্কেলের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপক বা লগ্নিপত্রকোষ ব্যবস্থাপক হিসেবে বিনিয়োগ ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

৭. **ব্যবস্থাপনার ভূমিকা :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং বিশেষজ্ঞ ও পেশাদারী কর্মীদের দিয়ে লগ্নিপত্রের নতুন ইস্যুর দক্ষ ব্যবস্থাপনা করে। তাছাড়া মার্চেন্ট ব্যাঙ্কাররা দক্ষ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা, ইচ্ছাধীন ব্যবস্থাপনা ও

বাণিজ্যিক কাগজপত্রের ব্যবস্থাপনাতেও যুক্ত থাকে।

৮. **শেয়ার দালাল হিসাবে সওদাগরী ব্যাঙ্কারের ভূমিকা :** শেয়ার বাজার ও বিনিয়োগকারীদের সংযোগকারী ব্যক্তি হল শেয়ার দালাল। সওদাগরী ব্যাঙ্কাররা শেয়ার দালাল হিসাবে শেয়ার বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৯. **মূলধন পুনর্গঠনের ভূমিকা :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং বর্তমানে কোম্পানীর অন্তর্ভুক্তি, একত্রীকরণ ও অধিগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মার্চেন্ট ব্যাঙ্কাররা মূলধন পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর ভবিষ্যতে মূলধন প্রকল্প প্রস্তুত করে এবং বিভিন্ন দপ্তরের কাছ থেকে অনুমতি সংগ্রহ করে। কোম্পানীর মূলধনের ভিত শক্ত ও বিস্তৃত করতে এরা মূলধন পুনর্গঠনের পরামর্শ দেয়।

১০. **প্রকল্পের পরামর্শদাতা হিসাবে সওদাগরী ব্যাংকারের ভূমিকা :** প্রকল্পের পরামর্শ দাতার কাজ হল কোনো প্রকল্পের কারিগরী, আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিকগুলি খতিয়ে দেখা। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কাররা প্রকল্প পরামর্শ প্রদানে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই ব্যাঙ্কাররা পরামর্শ প্রদান ছাড়াও আরও আনুষঙ্গিক কাজে (যেমন বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের থেকে অনুমতি সংগ্রহ করা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১১. **ঋণ সংগ্রহের ভূমিকা :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্কাররা কোম্পানীর জন্য ঋণ পরিকল্প প্রস্তুত করে এবং ঋণপ্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে মেয়াদী ও কার্যকরী মূলধনের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করে।

8.5.3 মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত সেবির নির্দেশাবলী :

মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও অন্যান্য বিষয় সেবি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ সেবির নির্দেশাবলী মেনেই ভারতে মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক গুলি পরিচালিত হয়। মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করতে হলে সেবির কাছে নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। ভারতে এর মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় মার্চেন্ট ব্যাঙ্কগুলি চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এরা হল (ক) প্রথম শ্রেণীভুক্ত, (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, (গ) তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত এবং (ঘ) চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত। মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত সেবির বিভিন্ন নির্দেশাবলী নিচে আলোচনা করা হল :

মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের নিবন্ধন সংক্রান্ত সেবির নির্দেশাবলী :

১. **সেবির কার্যবিধি :** আবেদনকারী মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক সেবি -র সুনির্দিষ্ট কার্যবিধি মেনে কাজ করবে।

২. **বিধিবদ্ধ সংস্থা :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্কগুলিকে বিধিবদ্ধ সংস্থা হতে হবে। এই ব্যাঙ্কগুলি জানগণের কাছ থেকে আমানত জমা নিতে পারবে না।

৩. **ন্যূনতম পর্যাপ্ত মূলধন :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্কটিকে ন্যূনতম পর্যাপ্ত মূলধনের অধিকারী হতে হবে। অর্থাৎ তার আদায়ীকৃত মূলধন ও সঞ্চয়ের পরিমাণ সেবি -র নিয়ম অনুসারে পর্যাপ্ত হতে হবে।

৪. **পরিকাঠামো :** আবেদনকারী মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো থাকতে

হবে। অর্থাৎ যথেষ্ট জায়াগযুক্ত অফিস ঘর, প্রয়োজনীয় শ্রম-সাশ্রয় যন্ত্রপাতি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপক ও কর্মী থাকতে হবে, যাতে দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হয়।

৫. **অভিজ্ঞ কর্মী :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও দক্ষ কমপক্ষে এমন দুজন ব্যক্তি নিযুক্ত করতে হবে যাদের অর্থ, আইন বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পেশাগত যোগ্যতা আছে।

৬. **বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষা :** আবেদনকারী মার্চেন্ট ব্যাঙ্ককে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭. **দর্শনী প্রদান :** নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী মার্চেন্ট ব্যাঙ্ককে নির্দিষ্ট পরিমাণ দর্শনী প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

৮. **লগ্নি বাজারের কোনো মোকদ্দমায় অংশগ্রহণ :** আবেদনকারী মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক বা তার অংশীদার বা প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা ব্যবস্থাপক লগ্নি বাজারের সম্পর্কযুক্ত কোনো মোকদ্দমায় জড়িত থাকবে না।

মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের নিবন্ধন বা নবীকরনের চাঁদা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

১. **নিবন্ধনের চাঁদা :** (ক) প্রথম শ্রেণীভুক্ত মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের জন্য প্রথম দু-বছর ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করে এবং তৃতীয় বছরের জন্য ১ লক্ষ টাকা চাঁদা হিসাবে দিতে হয়। (খ) দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হিসাবে প্রথম দু-বছর এবং ৫০ হাজার টাকা তৃতীয় বছরের জন্য দিতে হয়। (গ) তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা হিসাবে প্রথম দু-বছর এবং ২৫ হাজার টাকা তৃতীয় বছরের জন্য দিতে হয়। (ঘ) চতুর্থ শ্রেণিভুক্ত মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে ৫ হাজার টাকা করে প্রথম দু-বছর এবং ১ হাজার টাকা তৃতীয় বছরের জন্য দিতে হয়।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রথম শ্রেণিভুক্ত ছাড়া অন্যান্য মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের নিবন্ধও বন্ধ হয়ে গেছে। এই বছর থেকে প্রথম শ্রেণিভুক্ত মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের নিবন্ধনের চাঁদা বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লক্ষ টাকা হয়েছে।

২. **নবীকরণের চাঁদা :** মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার হিসাবে সেবি -র কাছে প্রথমে তিন বছরের জন্য নিবন্ধন করতে হয়। তারপরে আরও পরবর্তী তিন বছরের জন্য পুনর্নবীকরণ করা যায়। তবে প্রথম নিবন্ধনের সময়সীমা শেষ হওয়ার তিন মাস পূর্বে পুনর্নবীকরণের আবেদন করতে হয়। পুনর্নবীকরণের জন্য যে যে পদ্ধতিতে চাঁদা প্রদান করতে হয়, সেগুলি হল— (ক) প্রথম শ্রেণিভুক্ত মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে প্রথম দু-বছর ১ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় বছরের জন্য ২০ হাজার টাকা চাঁদা বাবদ দিতে হয়। (খ) দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে প্রথম দু-বছর ৭৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় বছর ১০ হাজার টাকা চাঁদা বাবদ দিতে হয়। (গ) তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে প্রথম দু-বছর ৫০ হাজার টাকা এবং তৃতীয় বছর ৫ হাজার টাকা চাঁদা বাবদ দিতে হয়। (ঘ) চতুর্থ শ্রেণিভুক্ত মার্চেন্ট

ব্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে প্রথম দু-বছর ৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় বছরের জন্য ২ হাজার টাকা চাঁদা বাবদ দিতে হয়।

মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সেবির ক্ষমতা :

১. সেবি মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারদের বই, নথিপত্র ও দলিলপত্র পরিদর্শন করতে পারবে।

২. সেবি মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারদের সম্পর্কে বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারদের অভিযোগগুলো তদন্ত করতে পারবে।

৩. সেবি বিনিয়োগকারীদের ও লগ্নিপত্রের কারবারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবে।

৪. সেবি কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন নিরীক্ষক নিযুক্ত করে কোনো মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের হিসাবের বই তদন্ত করতে পারবে।

৫. পরিদর্শন রিপোর্ট বা প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু দেখার পর সেবি সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারদের ডেকে তার কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারে।

৬. নিবন্ধন করার সময়ে যে-সব শর্ত আরোপ করা হয়েছিল তার কোনোটা অমান্য করলে অথবা সেবি আইনের কোনো ধারা বা বিধি অমান্য করলে সেবি সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের নিবন্ধনপত্র সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করতে পারে।

সেবির নির্দেশাবলী না মানার শাস্তি :

১. নিবন্ধন স্থগিত রাখা :

কোনো মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক সেবি-আইন অমান্য করলে, তথ্য দিতে ব্যর্থ হলে, মিথ্যা তথ্য পেশ করলে, কালান্তিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করলে, তদন্তে সহযোগিতা না করলে, অভিযোগ মেটাতে ব্যর্থ হলে, তছরুপ ও দামে কারচুপির মতো অনৈতিক কাজ করলে, আচরণ বিধি ভঙ্গ করলে, সেবি-কে নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা না দিলে এবং নিবন্ধনের শর্ত ভঙ্গ করলে সেবি সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের নিবন্ধন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারে।

২. নিবন্ধন বাতিল :

কোনো মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক অনৈতিক কৌশলে লগ্নিপত্রের দামে কারচুপি করলে, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করলে, অপরাধমূলক কাজের জন্য শাস্তি পেলে এবং বার বার একই ধরনের ত্রুটিমূলক কাজ করলে সেবি সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের নিবন্ধন বাতিল করতে পারে।

8.6 ক্রেডিট রেটিং বা ঋণ মান নির্ণয়

8.6.1 ধারণা

ঋণসংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের বা ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা পরিমাপ করে পূর্ব নির্ধারিত প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে ঋণপত্রের বা বণ্ডের মান নিরূপনের প্রক্রিয়াকে ক্রেডিট রেটিং বা ঋণমান নির্ণয় বলে।

অধ্যাপক এল. এম. ভোলে এর মতে— ''ঋণপত্রের স্বচ্ছলতা অর্থাৎ ঋণ পরিশোধে ঋণগ্রহীতার ক্ষমতা পরিমাপ করে পূর্ব-নির্ধারিত প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে ঋণপত্রের মান নির্ধারণের কাজকে ক্রেডিট রেটিং বলে।''

8.6.2 ক্রেডিট রেটিং এর বৈশিষ্ট্য

ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা পরিমাপ করে পূর্বনির্ধারিত প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে ঋণপত্রের মান নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে বলে ঋণমান নির্ণয় বা ঋণ গ্রহণযোগ্যতার মানক্রম বা ক্রেডিট রেটিং। ঋণমান নির্ণয় বা ঋণগ্রহণযোগ্যতার মানক্রম বা ক্রেডিট রেটিং এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হল :

১. **প্রতীক চিহ্ন :** ক্রেডিট রেটিং প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যেমন AAA প্রতীক চিহ্ন, AA প্রতীক চিহ্ন, A প্রতীক চিহ্ন ইত্যাদি। AAA প্রতীক চিহ্ন হল সর্বোচ্চ নিরাপদ, AA প্রতীক চিহ্ন হল উচ্চ নিরাপদ এবং A প্রতীক চিহ্ন হল পর্যাপ্ত নিরাপদ।

২. **ঝুঁকি সচেতনতা :** ক্রেডিট রেটিং করা হয়ে থাকে কোনো ঋণপত্রের বিনিয়োগের ঝুঁকি সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের সচেতন করার জন্য।

৩. **ঋণ গ্রহণযোগ্যতা :** ক্রেডিট রেটিং-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিলিযোগ্য ঋণপত্রের ঋণ গ্রহণযোগ্যতার ক্ষমতা ও গুণগত মান নির্ধারণ করা হয়।

৪. **মেয়াদ :** ঋণপত্রে যে প্রতীক চিহ্ন থাকে সেটি ঐ ঋণপত্রের মান নির্দেশ করে। কিন্তু ঐ মান যে দীর্ঘকাল ধরে একই থাকবে তা নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ঋণপত্রের মান ওঠানামা করতে পারে।

৫. **বিবেচ্য বিষয় :** ঋণপত্রের গুণগত মান নির্ধারণের সময় যে সমস্ত বিষয় সাধারণভাবে বিবেচনা করা হয় সেগুলি হল শিল্প ঝুঁকি, বাজারের অবস্থান, প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা, বিগত কয়েক বৎসেরর প্রতিষ্ঠানের কাজের খতিয়ান, প্রতিষ্ঠানের মুনাফা যোগ্যতা, প্রতিষ্ঠানের সম্পদের গুণগত মান ও তারল্যের অবস্থা, ইত্যাদি।

৬. **শংসাপত্র নয় :** ক্রেডিট রেটিং বিলিকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বা তথ্য বিবেচনা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ঋণপত্রটির গুণগত মান স্থির করে দেয়। এটি কিন্তু ঋণপত্র সম্পর্কে শংসাপত্র বা সার্টিফিকেট নয়। এই ঋণপত্রের বিনিয়োগ করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

বিনিয়োগকারীকেই নিতে হয়।

৭. **ধারণা সৃষ্টি :** ক্রেডিট রেটিং বিনিয়োগকারীদের কোনো বিশেষ ঋণপত্র কেনার সুপারিশ করে না। এটি কোনো ঋণপত্র সম্পর্কে ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীদের ধারণা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে থাকে।

৮. **কলা ও বিজ্ঞান :** ক্রেডিট রেটিং বা গুণমান নির্ণয় কলা ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ। এটি কলা কারণ ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা, ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এবার এটি বিজ্ঞান কারণ এতে পরিসংখ্যান পদ্ধতি বা রাশিবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়।

8.6.3 ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা পরিমাপ করে পূর্বনির্ধারিত প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে ঋণপত্রের ঋণ নির্ধারনের প্রক্রিয়াকে বলে ক্রেডিট রেটিং। ক্রেডিট রেটিং এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারনা পেয়ে থাকে। ক্রেডিট রেটিং সাধারণতঃ যে কাজগুলি করে থাকে তা নিম্নরূপ

১. **ঝুঁকির নির্দেশক :** ক্রেডিট রেটিং এর প্রতীক চিহ্ন ঋণপত্রের ঝুঁকি সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের সর্তক করে। ক্রেডিট রেটিং সমীক্ষা করে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

২. **কোম্পানির প্রতি ধারণা :** ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলি যদিও লগ্নিপত্রের রেটিং করে, তা সত্ত্বেও এই রেটিংয়ের মান থেকে কোম্পানির পরিচালন ব্যবস্থা, সংগঠনগত আচরণ আর্থিক অক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়গুলিও বোঝা যায়। যার ফলে বিনিয়োগকারীরা কোম্পানি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে।

৩. **পেশাগত পরিসেবা :** ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির কর্মীরা পেশাগত যোগ্যতায় দক্ষ। তাই তাদের তৈরি রেটিং মান থেকে বিনিয়োগকারীরা দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীদের পেশাগত পরিসেবা পেয়ে থাকে।

৪. **আর্থিক শক্তি ও দুর্বলতা :** কোম্পানিগুলির আর্থিক অনুপাত বিশ্লেষণ করে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপার্জন ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে রেটিং এজেন্সিগুলি সেই কোম্পানির লগ্নিপত্রগুলির রেটিং করে। যার ফলে ক্রেডিট রেটিং পদ্ধতি কোম্পানির আর্থিক শক্তি ও দুর্বলতার দিকগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে।

৫. **লগ্নিপত্রের গুণগতমান :** লগ্নিপত্রের গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলি কোন্ কোন্ অনুপাত বিশ্লেষণ করবে তার একটি লিখিত নির্দেশাবলি আছে। যার ফলে ক্রেডিট রেটিংয়ের মাধ্যমে লগ্নিপত্রের সঠিক গুণগতমানই প্রকাশ পায়।

৬. **তুলনামূলক বিচার :** ক্রেডিট রেটিং প্রতীক চিহ্নের দ্বারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লগ্নিপত্রের গুণগতমান এবং রেট নির্ণয় করে। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন কোম্পানির বিলিকৃত লগ্নিপত্রগুলির সুবিধা ও বিলিকৃত কোম্পানিগুলির আর্থিক অবস্থা খুব সহজেই তুলনা করতে পারে।

৭. **কার্যনির্বাহীদের সাহায্য :** লগ্নিপত্রের রেটিংয়ের ফলে শেয়ার বাজারের কার্যনির্বাহী, যেমন— শেয়ার

দালাল ও মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারদের শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের কাজ করতে সুবিধা হয়।

৮. **বিনিয়োগকারীদের পথনির্দেশক :** 'ক্রেডিট রেটিং' বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করে। কারণ বিনিয়োগকারীরা লগ্নিপত্রের রেটিংয়ের মান দেখে তবেই বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়।

8.6.4 ক্রেডিট রেটিং এর সীমাবদ্ধতা

ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা পরিমাপ করে পূর্বনির্ধারিত প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে ঋণপত্রের মান নির্ণয়ের প্রক্রিয়াকে বলে ঋণমান নির্ণয় বা ঋণ গ্রহণযোগ্যতার মানক্রম বা ক্রেডিট রেটিং। ঋণমান নির্ণয় বা ঋণ গ্রহণযোগ্যতার মানক্রম বা ক্রেডিট রেটিং-এর সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধা বা দুর্বলতা বা ত্রুটিগুলি হল—

১. **ঋণমানের বিভিন্নতা :** বাস্তবে দেখা যায় ঋণপত্র বিলিকারী প্রতিষ্ঠান একাধিক ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থার কাছে ঋণমান নির্ণয় করে তাদের মধ্যে উচ্চ ঋণমান যেটি সেটি গ্রহণ করে বিনিয়োগকারীদের কাছে তুলে ধরে। এতে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. **অনির্ভরযোগ্যতা :** ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থাগুলির প্রদত্ত ঋণমান সবসময় নির্ভরযোগ্য হয় না। বাস্তবে দেখা যায় ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থার অধ্যবসায় ও সততার অভাবে সর্বোচ্চ নিরাপত্তাযুক্ত ঋণপত্র খারাপ হয়েছে এবং নিয়মিত প্রতিদান দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

৩. **অনাদায়ী ঝুঁকি সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ :** ক্রেডিট রেটিং বিনিয়োগকারীদের অনাদায়ী ঝুঁকি নির্ধারণ সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ।

৪. **ভুল মূল্যায়ন :** ঋণমান নির্ণয়কারীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে এবং উপযুক্ত তথ্যের অভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋণপত্রের ভুল ঋণমান প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই ভুল সংশোধন করা হলেও এই ব্যাপারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট হয়।

৫. **উদ্দেশ্যগত তথ্যের অভাব :** বাস্তবে সমস্ত ঋণমানে উদ্দেশ্যগত তথ্য দেওয়া হয় না। ফলে ঝুঁকির প্রকৃত মাত্রা বিনিয়োগকারীদের কাছে অজ্ঞাত থাকে।

৬. **অতিরঞ্জন :** ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থাগুলি অনেক সময় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মক্কেল প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্রের মান প্রকৃত মান অপেক্ষা উন্নত করে দেখায়। এতে বিনিয়োগকারীরা প্রতারিত হয়।

5.6.5 ভারতীয় ক্রেডিট রেটিং সংস্থাগুলির বিবরণ

যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীগুলি তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ বাবদ অর্থ সংগ্রহ করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন করে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা পরিমাপ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমেরিকায় প্রথম প্রতিষ্ঠান Standard and Poor ১৮৬০ সালে

প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০৯ সালে আমেরিকান ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য Moody নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ১৯৮৭ সালে ভারতবর্ষে প্রথম এই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, যারা বিভিন্ন ঋণ পত্র বা ঐ ধরনের প্রতিজ্ঞাপত্রের গুণগত মান নির্ণয় করে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় UTI, ICICI, LIC, GIC, ADB প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের সুনামের স্বার্থে ভারতীয় ঋণ মান তথ্য পরিষেবা লিমিটেড (Credit Rating Information Service of India Limited (CRISIL) গঠন করে। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান এই ধরনের সেবা পরিবেশনের জন্য গঠিত হয়। নীচে কয়েকটি মান নির্ধারণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

8.6.5.1 ভারতের ঋণ মান নির্ণয় তথ্য পরিষেবা লিমিটেড/ক্রিসিল (CRISIL) (Credit Rating Information Service of India Limited)

১৯৮৭ সালে ভারতবর্ষে প্রথম এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। ভারতীয় ইউনিট ট্রাস্ট ভারতীয় জীবন বীমা করপোরেশন ভারতীয় শিল্পোয়ন ব্যাঙ্ক সাধারণ বীমা করপোরেশন ভারতের শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন এবং এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এর যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি তার কাজ শুরু করে ১৯৮৮ সালে। ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুন নাগাদ ৪৬২টি কোম্পানির ৫৮৬টি ঋণসংক্রান্ত বিনিয়োগ পত্রের মান নিরূপণের দায়িত্ব পায়। এই কোম্পানিগুলির মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৩২,১৪২ কোটি টাকা। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হল কোম্পানীগুলোর নির্দেশ অনুসারে তাদের ঋণপত্র, স্থির আমানত, স্বল্পমেয়াদী ঋণ দলিল এবং অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ারগুলির মান নির্ধারণ করা। যখন কোন সওদাগরী ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্ক, ভারতের ইউনিট ট্রাষ্ট যখন কোন কোম্পানী পরিষেবা দেয় তখন তারা এই প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত মান বিবেচনা করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্দেশ্য হল কোম্পানিগুলির নির্দেশ অনুসারে তাদের ডিবেঞ্চার, স্থায়ী আমানত, বাণিজ্যিক পত্র, অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার, স্বল্প মেয়াদী ঋণ, ইত্যাদির মান নির্ধারণ করে।

ক্রিসিল রেটিং-এর প্রতীক চিহ্ন

ক্রিসিল রেটিং-এ যে-সব প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে আর্থিক দলিলের বা রেটিং প্রকাশ করা হয় তা নিচের তালিকার মাধ্যমে তা দেখানো হল :

ডিবেঞ্চার রেটিং-এর ক্ষেত্রে/দীর্ঘ-মেয়াদী দলিলের ক্ষেত্রে

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা	→	AAA
উচ্চ নিরাপত্তা	→	AA
পর্যাপ্ত নিরাপত্তা	→	A
পরিমিত নিরাপত্তা	→	BBB
অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা	→	BB

উচ্চ ঝুঁকিবহুল	→	B
অতি উচ্চ ঝুঁকিবহুল	→	C
খেলাপের সম্ভাবনা বা প্রদানে অক্ষম	→	D

স্থায়ী আমানত/মধ্য-মেয়াদী দলিলের ক্ষেত্রে

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা	→	FAAA
উচ্চ নিরাপত্তা	→	FAA
পর্যাপ্ত নিরাপত্তা	→	FA
অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা	→	FB
উচ্চ ঝুঁকিবহুল	→	FC
খেলাপের সম্ভাবনা বা প্রদানে অক্ষম	→	FD

স্বল্প মেয়াদী ঋণ দলিলের ক্ষেত্রে

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা	→	P_1
উচ্চ নিরাপত্তা	→	P_2
পর্যাপ্ত নিরাপত্তা	→	P_3
অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা	→	P_4
খেলাপ হওয়ার সম্ভাবনা বা প্রদানে অক্ষম	→	P_5

8.6.5.2 বিনিয়োগ তথ্য এবং ঋণ গ্রহণযোগ্যতার মানক্রম নির্ণয় সংস্থা বা ইকরা (Investment Information and Credit Rating Agency) (ICRA)

১৯৯১ সালে ইকরা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইকরা গঠনের উদ্দেশ্য হল ডিবেঞ্চার, বন্ড ইত্যাদির মতো দীর্ঘ-মেয়াদী, মধ্য-মেয়াদী ও স্বল্প-মেয়াদী আর্থিক দলিলের মান নির্ণয় করা। ১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ইকরা কোম্পানীর ইক্যুইট শেয়ারেরও রেটিং বা মান নির্ণয় করে আসছে। এর ইক্যুইটি শেয়ার রেটিং করার একটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী আছে। এই গোষ্ঠীর নাম ''আয় সম্ভাবনা এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণ গোষ্ঠী''। এই গোষ্ঠী প্রাথমিক বাজার বা ইস্যু মার্কেটে কোম্পানীর ইক্যুইটি শেয়ারের স্তর বিভাজন করে। এই গোষ্ঠী গৌণ বাজারে বা শেয়ার বাজারে ইক্যুইটি শেয়ারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও নিরূপণ করে। বিলিকারী কোম্পানীর হয়ে ইকরা প্রাথমিক বাজারে ইক্যুইটি শেয়ারের রেটিং করে, কিন্তু যখন ইকরা গৌণ বাজার বা শেয়ার বাজারে ইক্যুইটি শেয়ারের রেটিং করে তখন সে বিনিয়োগকারীদের পক্ষে রেটিং করে। ইকরা ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নামকরা

ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি।

ইকরা রেটিং-এ যে-সব প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে আর্থিক দলিলের মান বা রেটিং প্রকাশ করা হয়, নিচের চার্টে তা দেখানো হল :

দীর্ঘ-মেয়াদী ডিবেঞ্চার, বন্ড ও প্রেফারেন্স শেয়ারের ক্ষেত্রে

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা	→	LAAA
উচ্চ নিরাপত্তা	→	LAA+, LAA
পর্যাপ্ত নিরাপত্তা	→	LA+, LA
পরিমিত নিরাপত্তা	→	LBBB+, LBB
অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা	→	LBB+, LBB
উচ্চ ঝুঁকিবহুল	→	LB+, LB
অতি উচ্চ ঝুঁকিবহুল	→	LC+, LC
খেলাপের সম্ভাবনা বা প্রদানে অক্ষম	→	LD

মধ্য-মেয়াদী স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা	→	MAAA
উচ্চ নিরাপত্তা	→	MAA+, MAA
পর্যাপ্ত নিরাপত্তা	→	MA+, MA
অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা	→	MB+, MB
উচ্চ ঝুঁকিবহুল	→	MC+, MC
খেলাপের সম্ভাবনা বা প্রদানে অক্ষম	→	MD

স্বল্প মেয়াদী লগ্নি দলিল/ বানিজ্য পত্রের ক্ষেত্রে

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা	→	A_1+, A_1
উচ্চ নিরাপত্তা	→	A_2+, A_2
পর্যাপ্ত নিরাপত্তা	→	A_3+, A_3
অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা	→	A_4+, A_4
খেলাপ হওয়ার সম্ভাবনা বা প্রদানে অক্ষম	→	A_5

8.6.5.3 ক্রেডিট অ্যানালিসিস অ্যান্ড রিসার্চ লিমিটেড বা কেয়ার (CARE) (Credit Analysis and Research Ltd.) (CARE) :

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে কেয়ার একটি ঋণমান নির্ধারণকারী কর্পোরেট সংস্থা হিসাবে গঠিত হয় এবং ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে কাজ শুরু করে। ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক এবং কয়েকটি আর্থিক পরিষেবা কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানির বিলিযোগ্য ঋণপত্রের ঋণমান নির্ণয় করে, বিলিকারী প্রতিষ্ঠানের হয়ে প্রাথমিক বাজরের জন্য ঋণপত্রের স্তর বিভাজন করে, ডিবেঞ্চার, বাণিজ্যিক পত্র, স্থায়ী আমানত ইত্যাদির ঋণমান নির্ণয়ের পরিষেবা প্রদান করে।

কেয়ার রেটিংয়ের প্রতীক চিহ্ন

দীর্ঘকালীন মধ্যকালীন লগ্নিপত্র

AAA — সর্বোচ্চ মানের বিনিয়োগ

AA — উচ্চমানের বিনিয়োগ

BBB — পর্যাপ্ত নিরাপত্তাপূর্ণ

BB — ফাটকাপূর্ণ

A — উপযুক্ত নিরাপত্তাপূর্ণ

C — উচ্চমানের বিনিয়োগ ঝুঁকি, প্রদানে অক্ষম হতে পারে

B — উচ্চমানের বিনিয়োগ ঝুঁকি

D — সর্বনিম্নমানের, প্রদানে অক্ষম হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল

স্বল্পকালীন লগ্নিপত্র

PR_1 — পরিশোধের ক্ষমতা সর্বোচ্চ

PR_2 — পরিশোধের উচ্চ ক্ষমতা

PR_3 — প্রদানের পর্যাপ্ত সামর্থ্য আছে

PR_4 — নূনতম নিরাপত্তা

PR_5 — প্রদানে অক্ষম হতে পারে

8.6.5.4 ওনিডা ইনডিভিজুয়াল ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অফ্ ইন্ডিয়া লিমিটেড বা নিকরা : (Onida Individual Credit Rating Agency of India Ltd. : ONICRA)

ওনিকরা ভারতে প্রথম বেসরকারি ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থা। ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে এটি গঠিত হয়। ওনিডা ফিনান্স লিমিটেড -এর উদ্যোগে এই সংস্থা গড়ে ওঠে। ওনিকরার প্রধান প্রধান কাজগুলি হল :

১. একটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদিত ঋণ সংক্রান্ত লেনদেনের ঝুঁকির পরিমাণ পরিমাপ করা।

২. কোনো অ-বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যে ঝুঁকির মান নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে তাকে ঝুঁকির পরিমাণ সম্পর্কে এবং ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা বা ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করা।

৩. ক্রেডিট কার্ড, গৃহঋণ, ভাড়া ক্রয় চুক্তি, ভাড়া চুক্তি, ব্যক্তিগত ঋণ বা কোন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা

প্রদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে মান নির্ণয় করে এর মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করা হয়।

8.6.5.5 ডাফ অ্যান্ড ফেলপস ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড/ডিসিআর (Duff and Phelps Credit Rating Agency of India Ltd. : DCR)

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে এই বেসরকারি রেটিং এজেন্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সি ডাফ এবং ফেলপস -এর সঙ্গে জে এম ফিন্যান্সিয়াল গ্রুপ যৌথভাবে ডাফ অ্যান্ড ফেলপস ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অফ ইন্ডিয়া লিমিডেট প্রতিষ্ঠা করে। ব্যাঙ্ক নয় এমন সব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্থায়ী আমানতের উপর সাধারণত এই কোম্পানিটি রেটিং করে থাকে। সাধারণত এই এজেন্সিটি রেটিং করার সময় সেই প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পর্যাপ্ততা, আর্থিক সচ্ছলতা, লাভক্ষতির অবস্থা, ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি, উদ্যোগীদের ক্ষমতা, হিসাবরক্ষণের নীতি প্রভৃতি বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দেয়।

8.7 সারাংশ

আর্থিক বাজারে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি মধ্যস্থাকারী হিসাবে যে সমস্ত আর্থিক কাজকর্ম করে থাকে তাকেই আর্থিক পরিষেবা বলে। আর্থিক বাজারের কাজকে সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করাই আর্থিক পরিষেবার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমান অর্থনীতি ও বানিজ্যে মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক পরিষেবার গুরুত্ব অপরিসীম। মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা গুলি হল পরামর্শদাতা হিসাবে পরিষেবা দেওয়া, নতুন শেয়ার বিলি সংক্রান্ত কাজ, দায়গ্রহণের কাজ ইত্যাদি। ভারতবর্ষে মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ, সেবির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক পরিষেবা প্রতিষ্ঠান হল ক্রেডিট রেটিং সংস্থা। ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা পরিমাপ করে পূর্বনির্ধারিত প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে ঋণপত্রের মান নির্ধারনের প্রক্রিয়াকে বলে ক্রেডিট রেটিং। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্রেডিট রেটিং সংস্থাগুলি হল ক্রিসিল, কেয়ার, ইকরা, ওনিকরা, ডিসিআর ইত্যাদি।

শব্দগুচ্ছ

আর্থিক পরিবেষা

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনিয়োগকারী ও কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে বিভিন্ন ধরনের অর্থ সংক্রান্ত পরিষেবা বা সেবা প্রদান করে তাকে বলে আর্থিক পরিষেবা।

ফি ভিত্তিক বা উপদেশ ভিত্তিক বা পারিশ্রমিক ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা

যে সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকে বিনিময়ে ক্রেতা বা মক্কেলদের অর্থ সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করে।

ফাণ্ড-ভিত্তিক বা সম্পদ ভিত্তি আর্থিক পরিবেষা

যে সমস্ত আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করে।

মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক

যে সব আর্থিক সংস্থা অর্থসংগ্রহ, বাণিজ্যিক উদ্যোগ, ব্যাঙ্কিং, বিনিয়োগ, অধিগ্রহণ ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ, উপদেশ ও জ্ঞান দেয় ও অর্থের সওদা করে সেইসব আর্থিক সংস্থাকে মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক বলে।

ক্রেডিট রেটিং

ঋণপত্রের স্বচ্ছলতা অর্থাৎ ঋণ পরিশোধে ঋণগ্রহীতার ক্ষমতা পরিমাপ করে পূর্বনির্ধারিত প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে ঋণপত্রের মান নির্ধারণের কাজকে ক্রেডিং রেটিং বলে।

8.8 অনুশীলনী

1. আর্থিক পরিষেবা বলতে কি বোঝায়? আর্থিক পরিষেবার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
2. মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এর সংজ্ঞা দিন। মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী আলোচনা করুন।
3. মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এর ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
4. মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের নিবন্ধন সম্পর্কে সেবির নিয়মগুলি আলোচনা করুন।
5. ক্রেডিট রেটিং এর সংজ্ঞা দিন।
6. ক্রেডিট রেটিং-এর কার্যাবলী আলোচনা করুন।
7. ক্রেডিট রেটিং এর সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করুন।
8. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন
   (a) ক্রিসিল রেটিং
   (b) ইকরা রেটিং
   (c) কেয়ার রেটিং

Suggested Readings

- Bhole, L. M., Financial Markets and Institutions,TMH, New Delhi
- Gurusamy S, Financial Services, TMH
- Khan, M. Y., Indian Financial System-Theory and Practice. TMH, New Delhi
- Meir Khon, Financial Instution and Market, Oxford University Press, New Delhi
- Nayak and Sana, Indian Financial System (English and Bengali),Rabindra Liabary
- Pathak, B., Indian Financial System-Person, New Delhi